অভ্যুদয়ের বই

বন্ধু অমল

অরুণ আইন

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

শ্রীমান শীর্ষেন্দুশেখর দত্তকে

(আর-একটু বড় হয়ে পড়ে দেখার জন্য)

॥ এক ॥

ডালহৌসির এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিসের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। এখন কটা? খুব জোর দেড়টা কী পৌনে দুটো হবে। ডালহৌসি পাড়ায় এখন টিফিনের সময় চলছে। বিরাট বিরাট স্কাইস্ক্র্যাপার অফিস-বাড়িগুলি থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে মানুষ আর কেরানীর দল। বেরিয়ে এসে সামনের ফুটপাতে বসা ফেরিওয়ালাদের সামনে পিঁপড়ের মত ভিড় করছে। অফিসাররা গাড়ি নিয়ে গ্র্যাণ্ড হোটেল বা গ্রেট ইস্টার্নে যাবেন লাঞ্চ সারতে। তাঁদের গাড়ির তীক্ষ্ম কর্কশ হর্ন মুহুর্মুহু ডালহৌসি পাড়াকে সচকিত করে তুলছে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু আমার কোমরের নিচ থেকে পা দুটো আর আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে চাইছে না। পায়ের আর দোষ কী! সকাল থেকে ওর উপর দিয়ে কম ধকল যায়নি। সকালবেলা একশো পঞ্চাশ মাইল ট্রেন জার্নি করে এসেছি, এসেই ছুটেছিলাম ক্লাবে, সেখান থেকে দৌড়তে দৌড়তে এই এখানে। এর মধ্যে পেটে এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু পড়ে নি। মাথার ভেতরটা মাঝে-মাঝেই কেমন টলমল করে উঠছে। মুখের ভেতর একটা তেতো জল খেলা করে যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরেই।

আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি বাঁদিকের ফুটপাত ঘেঁসে পার্ক করা আর. এস. পাল্কিয়ালার ক্রিমসন কালারের নতুন প্রিমিয়াম প্রেসিডেন্টখানা। ওই গাড়িটা দেখে বুঝেছি, অমলকে এখানেই পাব।

হ্যাঁ, অমলকে পাওয়া এখন আমার খুবই জরুরি। অমলের মুখোমুখি এই মুহূর্তে আমাকে একবার দাঁড়াতে হবে, দাঁড়িয়ে দেখতে হবে, অমলের উঁচু মাথাটা তখনও তেমন উঁচু থাকে কি না, ওর ঝকঝকে সাদা চোখদুটোতে তখনও তেমন সকৌতুক নিষ্পাপ হাসিটা

লেগে থাকে কি না! না, অমল না, সব ভুল। তুই এসে একবার বলে যা, আমি যা শুনেছি সব ভুল। তুই কখনও এমন করতে পারিস না। তুই একা-একা ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে যেতে পারিস না। বিশ্বাসঘাতকতা আর যাকে মানাক তোকে মানায় না, তোর চেহারার সঙ্গেই খাপ খায় না। তুই তোর বন্ধুদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের ভাল চাইবি না, আমি জানি। আমি জানি অমল, এই মুহূর্তে পৃথিবীর ভূগোল ওলোট-পালট হয়ে গেলেও আমাকে ছাড়া তুই এশিয়ান গেমস খেলতে যাবি না। অথচ জানিস, সবাই বলছে, তুই নাকি তাই যাচ্ছিস।

হিসাব-মত ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল অমল। অমলের একহারা লম্বা ছিপছিপে চেহারা, ঈষৎ সামনে ঝুঁকে সিঁড়ি ভাঙছিল এক পা এক পা করে। ওর টকটকে ফর্সা রঙটা এক রাত্রেই কে যেন কালো করে দিয়েছে। অমল আগামীকাল ব্যাঙ্কক যাচ্ছে। যাচ্ছে ভারতীয় যুব বক্সিং-এর অধিনায়ক হয়ে। যাচ্ছে ওর বন্ধুদের পায়েব নিচে ফেলে। বিশ্বাসঘাতকতা করে।

অমলের হাতে এয়ার ইণ্ডিয়ার টিকিট : ব্যাঙ্কক যাওয়ার ছাড়পত্র। এই ছাড়পত্র পাওয়ার জন্যই তো অমল রাতের আঁধারে আমাদের পিঠে ছুরি মেরেছে। সেই ছাড়পত্র তো ও পেয়েছে। তবে আনন্দে উৎসাহে ও উৎফুল্ল হতে পারছে না কেন? ওরকম বিষণ্ণ পায়ে সিঁড়ি ভাঙতে হচ্ছে কেন তবে ওকে! ওর ফর্সা রঙের উপর এক বালতি ভুষো কালি কে ঢেলেছে!

পিঠে হাত পড়তে ফিরে দাঁড়িয়ে অমল যেন ভুত দেখার মত চমকে উঠল। আমার নেড়া মাথা দেখে ওর বিষণ্ণ চোখে একটা বুকফাটা উদ্বেগ আর কৌতূহলের ছায়া খেলে গেল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য, কাঁধ থেকে আমার হাতটা সহজভাবে সরিয়ে দিয়ে গুমোট মুখে বলল,—'ব্যস্ত আছি।'

যেন চোখের সামনে পৃথিবীর ঘৃণ্যতম জিনিসটি দেখছি এভাবে মুখের রেখাগুলি সাজিয়ে নিয়ে বললাম,—'জানি। জানি খুব ব্যস্ত।

কাল ব্যাঙ্কক যাচ্ছিস, আজ তো তোকে ব্যস্ত হতেই হবে। আর. এস. পাঞ্জিয়ালার সঙ্গে দেখা করতে হবে। বাড়ি ফিরে কিটস্ গুছোতে হবে। বাবা মাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইতে হবে। ব্যস্ত তো বটেই।' আমার গলার স্বর তখন সাপের ছোবলের মত হিসহিসিয়ে উঠছে, —'তা বন্ধুদের কাছে শুভেচ্ছা চাইতে যাবি না! যুব-বক্সিং-এ বাঙলার একমাত্র প্রতিনিধি—আমাদের বন্ধুদের তো গর্বের জিনিস। না কি, তোর সময় হবে না?'

—'আমি এমন কিছু অন্যায় করিনি, যার জন্য আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে তোর এই কথাগুলি শুনতে হবে।'

—'অন্যায় করিসনি! ছিঃ অমল, ছিঃ! তুই এভাবে আমাকে কষ্ট দিলি! তার চেয়ে আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে হাওড়া ব্রিজে নিয়ে গিয়ে উপর থেকে নিচের গঙ্গায় ঠেলে ফেলে দিতিস! বিশ্বাস কর্, তাতেও আমি এত কষ্ট পেতাম না!'

অমলের চোখদুটো ওর কোটরের মধ্যে ঝক-ঝক করে জ্বলে উঠল, দেখা গেল অমলের কণ্ঠেও কম বিষ ঝরে না,—'এই সেরেছে, তুই কি এখন এখানে নাকি-কান্না শুরু করবি নাকি! তুই জানিস, ওই মেয়েলি ব্যাপারটা আমার একদম সহ্য হয় না। আমি যা করেছি নিজের ভালোর জন্য। নিজের ক্যারিয়ার কে না চায়! তুই চাস না?' এই বলে অমল আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করল না। বাঁ পাশের ফুটপাথ ধরে হন-হন করে হেঁটে গেল দাঁড়িয়ে-থাকা প্রিমিয়াম প্রেসিডেন্টের দিকে।

সামনে জনারণ্য ডালহৌসি। বড়-বড় স্কাইস্ক্র্যাপারের ভিড়ে এখানে দেখা যায় না নীল আকাশ। পায়ের নিচের শক্ত অ্যাসফ্যাল্টের সদর্প ঘোষণায় কেউ কল্পনা করতে সাহস পায় না এক টুকরো সবুজ ঘাসের। তাই এই ডালহৌসিতে ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলির হৃদয়ও ওই স্কাইস্ক্র্যাপার আর অ্যাসফ্যাল্টের মত শক্ত ধাতুতে তৈরি। ঝড় জল বৃষ্টি—কিছুতেই গলে না এ হৃদয়। ক্যারিয়ার গড়ে তুলছে মানুষ এখানে দ্রুত। অথচ সেই শহরে—যেখানে মাথার উপর ছিল

অন্তহীন নীল আকাশ আর পায়ের নিচে আদিগন্ত ছড়ানো সবুজ ঘাসের বন, যে শহরের নাম জামশেদপুর সেই শহরে!

সারাদিনের না-খাওয়া শরীরে মাথা ঝিম-ঝিম করছিল। অথচ মোটে তো এক দিন। আমি পর-পর পাঁচ দিন না খেয়েও সটান দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। কিন্তু এই মুহূর্তে যে আঘাতটুকু অমল দিয়ে গেল, তার পরও আমি দাঁড়িয়ে আছি, এটাই তো একটা সবচেয়ে বড় বিস্ময়। আসলে বোধহয় মানুষ সব আঘাত সব বিস্ময়ই কাটিয়ে উঠতে পারে। অবসন্ন শরীরে কখন যেন এয়ার ইণ্ডিয়ার দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। পাশেই ছোট্ট একটা চায়ের দোকান। দোকানের ছোট ছেলেটি চেঁচিয়ে লোক ডাকছে। আমাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মৃদু নরম গলায় ডাকল,—'বাবু আসুন। চা খাবেন নাকি?'

আমার ক্লান্ত চোখ ছেলেটির মুখের উপর পড়ল। কত বয়স হবে ছেলেটির? বড় জোর ছয় কী সাত। এই বয়সেই খাটতে এসেছে। কী নরম আর মিষ্টি মুখ ছেলেটির! ও এখনও জানে না, এই পৃথিবীটা কত কঠিন আর নিষ্ঠুর। ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে কত আঘাত আর কত বিস্ময়। তখন ওর এই নরম মিষ্টি মুখটা দেখতে দেখতে একদিন একটা চারকোনা চৌকো মুখে পরিণত হয়ে যাবে, বেচারা জানতেও পারবে না। মনের ভেতর কেনই যেন হু-হু করে উঠল।

বেঞ্চের এক কোনায় বসে পড়লাম ক্লান্ত বিষণ্ণ শরীরটা নিয়ে। বসতেই এক ভাঁড় চা এনে রাখল সামনে ছেলেটি। এক চুমুক চায় শুকনো কাঠ-হয়ে-যাওয়া গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলাম। পকেট হাতড়ে চারমিনারের দোমড়ানো প্যাকেটটা খুঁজে পেলাম। কিছুতেই মন স্থির থাকছে না। অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট তুলে নিলাম ঠোঁটে। দেশলাই জ্বেলে আগুনের নরম পরশে ডুবিয়ে নিলাম ওকে। এক ঝলক ধোঁয়ায় বুকের ভেতরটা হাল্কা হয়ে আসতে চাইছে। আর এক চুমুক চায়ের সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া আস্তে আস্তে গড়িয়ে গেল আমার মুখ দিয়ে। ধোঁয়ার একটা পাতলা পর্দা দুলতে দুলতে

ছড়িয়ে পড়ছে সামনে। পর্দার আড়ালে সামনের ব্যস্ত শহরটা কখন যেন আস্তে আস্তে মুছে যেতে লাগল। পরিবর্তে চোখের সামনে ভেসে আসছে আমার— আমাদের—স্বপ্নের শহর জামশেদপুর!

॥ দুই ॥

গরমের ছুটি পড়েছে। দীর্ঘ দেড় মাস ছুটি। কিন্তু ছুটির পরই পরীক্ষা। তাই নানারকম ফন্দি-ফিকির এঁটেও সকাল দশটার আগে পড়া ছেড়ে উঠতে পারছি না। অফিস-ফেরত বাবার প্রথম কাজই হল, মাকে জিজ্ঞাসা করা যে, আমি আজ কখন উঠেছি পড়া থেকে। মায়ের রিপোর্ট একটু এদিক-ওদিক হলেই— না, মার নয়, সিক্সে ওঠার পর থেকে বাবা আজকাল আর আমায় মারছেন না,—রাতের খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। উপোস—ওঃ, সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার! তার চেয়ে বাবার হাতে সেই লিকলিকে বেতের মার খাওয়া অনেক ভাল ছিল। রাতে খেতে না দিলে পেটের ভেতর অসভ্য ছুঁচোগুলো এমন বিশ্রীভাবে ডন মারতে শুরু করে আর মাথার ভেতর একটা গরম হাওয়া এমন ভোঁ-ভোঁ করতে থাকে যে কী বলব! তাই মানে মানে সকাল দশটা অবধি ওই বই নিয়ে বসে থাকতেই হয়। উপায় নাস্তি।

আজকেও সকাল থেকে উঠে, বাংলা বইটা নিয়ে 'থাকব না আর বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে' কবিতাটা দুলে দুলে পড়ে মুখস্থ করছিলাম। এটা আমার নিজের আবিষ্কৃত ফাঁকি মারার এক অব্যর্থ কৌশল। চেঁচিয়ে কবিতা পড়তে পড়তে দিব্যি আর পাঁচটা দরকারী কথা ভাবা যায়। ভাবা যায়, আজ গুলি খেলতে কোন্ পাড়ায় যাব। রতনের কাছে গতকালের পাওনা বাবদ আর কটা গুলি আছে। নচ্ছার গোপালকে কী ভাবে টিট করা যায়। অথচ রান্নাঘর থেকে মা দিব্যি শুনতে পাচ্ছেন আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করছি।

তবে কথা হল, কৌশলটা রোজ-রোজ খাটে না। মা বোধহয় ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছেন। কবিতা নিয়ে বেশীক্ষণ কসরত

করতে দেখলে মা আজকাল এসে বলেন,—'কি রে, কবিতা ছাড়া তোর আর কিছু পড়া নেই ? অঙ্ক কর !'

সত্যি, মায়েরা এমন তাড়াতাড়ি সব ব্যাপারগুলি আঁচ করে ফেলে না—যাচ্ছেতাই !

আজ কিন্তু কবিতার বই পড়ছিলাম দুলে দুলে—'থাকব না আর বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে।' মা অথচ আজ এসে আর তাড়া দিচ্ছেন না কেননা রান্নাঘরে মা এখন মিহিরের মায়ের সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত। উঃ মিহিরের মাকে আজ এত ভাল লাগছে না, যে কি বলব ! এবার নির্ঘাত বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় মিহিরের মাকে প্রণাম করার সময় পায়ের পাতায় চিমটি কাটব না—মা কালীর দিব্যি !

আজ সকাল থেকেই আমি উত্তেজনা বোধ করছি। আজ দশ নং বস্তিতে যাব গুলি-জিত খেলতে। পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ছেলে জিস্তের সঙ্গে কাল কথা হয়ে গেছে। ও বলছে,—'হাঁ, হাঁ, চলে আসিস কাল আমাদের বস্তিতে। দেখব তোর কত টিপ !'

শুনেছি, দশ নম্বর বস্তিতে অনেক টিপয়ালা ছেলে আছে। আর খেলেও সব একশো-দেড়শো গুলি নিয়ে। হ্যাঁ, এইভাবে খেলে আরাম আছে ! আমাদের পাড়ায় আর পাশের এগ্রিকো পাড়ায় এখন আর আমার সঙ্গে কেউ খেলতে চায় না। বলে,—'না ভাই, তোর সঙ্গে খেলব না। তুই একবার দান পেলেই আমাদের সব গুলি জিতে নিয়ে যাবি !'

আমিও আর চাই না ওদের সঙ্গে খেলতে। যত সব ভীতুর দল ! বড় তো খেলে সব পাঁচটা-দশটা গুলি নিয়ে ! ওই খেলায় কি আর মজা আছে ? জিস্তে বলেছে, ওরা একশো-দেড়শোর কম কেউ গুলি নিয়ে এলে তাকে খেলতেই নেয় না।

এগ্রিকো, সিদগোড়া শেষ করে আজ সকালে আমার আর-এক দিগ্বিজয়ে যাত্রা। এবার জয় করতে যাচ্ছি দশ নং বস্তি। আহা, ভাবতেও গায়ের ভেতর কেমন সির-সির করে কাঁটা দিয়ে যাচ্ছে !

আমার পাঁচটা পিউরিটি বার্লির কৌটো গুলিতে-গুলিতে ভর্তি হয়ে গেছে। আর ধরছে না। মায়ের সেলাই-কলের পাশে বসে রোজ বায়না ধরছি,—'মা, আমাকে একটা কাপড়ের লম্বা থলি বানিয়ে দাও।'

কিন্তু কথা হল, মা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন আমি দশ নং বস্তিতে গুলি-জিত খেলতে গেছি, তবে এক দিন নয়, পর-পর পাঁচ দিন খাওয়া বন্ধ করে অন্ধকার গুদোম ঘরে আটকে রাখবেন। কেননা দশ নং বস্তিতে কোন ভদ্রলোক থাকে না। মায়ের ধারণা, বস্তিতে যত সব চোর, বদমাইস, পকেটমাররা থাকে। শুধু আমারই নয়, আমাদের সব বন্ধুরই দশ নম্বর বস্তিতে খেলতে যাওয়া মানা। ওখানকার কোন ছেলের সঙ্গেও মেশা মানা।

অথচ মাকে কী করে বোঝাই আমাদের পাড়ার গোপাল, রতন, খোকনের চেয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারের ছেলে জিত্তে অনেক ভাল! আমাদের পাড়ার ছেলেরা ভীতু, নীচ। ওরা পাঁচটা-দশটার বেশী গুলি নিয়ে আসে না খেলতে। কখনো আমাকে খেলায় নেয় না। অথচ জিত্তেকে দেখ, বলা-মাত্র কেমন উদার হৃদয়ে বলে দিল,—'চলে আসিস, চলে আসিস আমাদের পাড়ায়।'

সাড়ে ন-টা বাজতেই বই গুছোতে শুরু করেছি। পৌনে দশটার সময় চোরের মত মুখ করে রান্নাঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে মাকে বললাম,—'দশটা বেজে গেছে, খেলতে যাব।'

মা কথা বলতে বলতে মুখ তুললেন। মার মুখ দেখেই বুঝলাম, মা এখন ভীষণ গল্পে মত্ত। বললেন,—'এর মধ্যে দশটা বেজে গেল!'

আমি ভাল ছেলের মত মুখ করে ঘাড় কাত করে বললাম,—'হ্যাঁ, তুমি দেখো।'

মা বললেন,—'আচ্ছা যা। দেরি করিস না কিন্তু। কাল দেরি করেছিলি, উনি খুব রাগ করছিলেন।'

আমি তখন একলাফে খিড়কি দোর ছুঁয়েছি, ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বললাম,—'আজ একটুও দেরি করব না, তুমি দেখে নিও।'

মেন রাস্তা পেরিয়ে এসে বারোয়ারি দুর্গাতলার মাঠ আড়াআড়ি কেটে আঠেরো নম্বর ক্রস রোড ধরে দৌড়চ্ছি দশ নম্বর বস্তির দিকে। খাকি রঙের হাফ-প্যান্টের দু-পকেট ভর্তি রয়েল গুলি। গুনি নি। গোনার সময় পাই নি। দুটো পিউরিটি বার্লির কৌটো দু-পকেটে উপুড় করে নিয়ে এসেছি। তা কম করেও আশি নব্বইটা তো আছে নিশ্চয়ই। দু-হাতে দু-পকেট চেপে ধরে দৌড়চ্ছি, যাতে পকেট থেকে গড়িয়ে না পড়ে যায়। দৌড়চ্ছি—কেননা ওদের খেলা শুরু হয় দশটায়, তার মধ্যে পৌঁছতে না পারলে ওরা খেলা শুরু করে দিলে মাঝ দানে আমাকে নাও নিতে পারে তাই পড়ি-কি-মরি করে দৌড়চ্ছি। বাঁ পাশে মদের ভাটি রেখে কৃষ্ণা রোডের শেষে যখন টিন-প্লেট কারখানার মাঠে এসে পৌছলাম, তখন আমি রীতিমত হাঁপাচ্ছি।

একটা কেন্দু গাছতলায় দেখলাম জিত্তে আরো চার-পাঁচটা ছেলেকে নিয়ে বসে আছে। ছেলেগুলির দিকে তাকাতেই আমার বুকটা কেমন ধক্ করে উঠল। হঠাৎ কানের কাছে কেন অজান্তেই জানি বেজে উঠল মায়ের স্বরঃ 'দেখিস, দেরি করিস না যেন, তাড়াতাড়ি ফিরিস।'

জিত্তে বাদে আর দুটি ছেলে পাঞ্জাবী, একটি মুসলমান, বাকি দুটি বিহারী। প্রত্যেকের চোখে সুর্মা। সবাই পান খাচ্ছে। মুসলমান ছেলেটির হাতে পাসিং শো সিগারেটের প্যাকেট। আমি আসা-মাত্র ফস্ করে একটা সিগারেট ধরাল। আমার খুব অবাক ঠেকল। ছেলেটি খুব বেশী হলে আমার চেয়ে বছর-চারেকের বড় হবে। বাবা-কাকারা ছাড়া আর কেউ সবার সামনে সিগারেট খায় এই প্রথম দেখলাম।

জিত্তে বলল,—'ঠিক সময় এসেছিস। আমরা এখনই শুরু করতাম। এরা সব দশ নম্বর-এর চাম্পিয়ান টিপ্পাবাজ। তুই বেপাড়া থেকে খেলতে আসবি শুনে এরা এসেছে।'

আমি শুকনো হেসে ঘাড় নাড়লাম।

জিত্তে বলল,—'এনেছিস ?'

আমি আবার ঘাড় নাড়লাম,—'হ্যাঁ।'

—'কটা ?'

—'আশি-নব্বুইটা হবে।'

—'গুনে দেখা।'

—'আগে তোদেরটা দেখা।'

এবার সিগারেট-হাতে মুসলমান ছেলেটা উঠে দাঁড়াল,—'হাঁ, হাঁ, জরুর দিখাব। এ দিখো আমার গোলি।'—বলে ছেলেটি প্যান্টের গেঁজের ভেতর থেকে বড় থলি বের করে ঝন-ঝন করে বাজিয়ে দেখাল, —'এখন তুমারটা দিখাও।'

আমিও প্যান্টের হু-পকেট বাজিয়ে শোনালাম।

—'নেহি, নেহি। গুনে দিখাও।'

অগত্যা প্যান্টের পকেট থেকে গুলিগুলো বের করে গোনা শুরু করলাম। পঁচানব্বইটা। সবকটাই নতুন চকচকে রয়েল গুলি। আড়চোখে চেয়ে দেখলাম, লোভে ওদের চোখগুলি কেমন জ্বলে উঠল।

মুসলমান ছেলেটি বলল,—'বেশ তুবে খেলা শুরু করা যাক। চোটে চার গোলি, বিল্লাস দো গোলি। রাজি ?'

—'রাজি'—আমি ঘাড় নাড়লাম।

জিত্তে প্রথম দান চালল। শুরু হল খেলা। তারপর টিন-প্লেট কারখানার আকাশ কাঁপিয়ে যখন বেলা বারোটার ভোঁ পড়ল, তখন আমার চমক ভাঙল।

বললাম,—'আর খেলব না। এবার বাড়ি যেতে হবে।'

আমার হু-পকেট তখন উপচে পড়ছে গুলিতে। এখন গায়ের জামা খুলে নিয়ে তাতে পুঁটলি করে রাখছি গুলি, পুঁটলিটা বাঁ হাতে ধরা। প্রথম আধ ঘণ্টা আমি বেধড়ক হারছিলাম। কিন্তু তার পর নতুন জায়গাটা আমার সয়ে যেতে খেলা খুলে গেল। জিত্তে-সহ চারজন ছেলের গুলি শেষ। আমি আর সাত্তার নামে মুসলমান

ছেলেটি সেসব ভাগাভাগি করে জিতে নিয়েছি। আমি বেশীটা। জিত্তের গুলি ফুরিয়ে যেতে ও আবার বাড়ি থেকে গুলি নিয়ে ফিরে এল এইমাত্র। বলল,—'আমি এই দান থেকে খেলছি কিন্তু।'

সাত্তার উৎসাহের সঙ্গে বলল,—'জরুর! জরুর!'

ওর বলার ভঙ্গীটা আমার ভাল লাগল না।

জিত্তে দান দিল।

আমি করুণ মুখে বললাম,—'এই, আমায় বাড়ি যেতে হবে। এর পর বাড়ি গেলে মা খুব বকবেন।'

মা বকবেন শুনে সাত্তার আর কেন্দু গাছের নিচে বসে-থাকা চারটি ছেলে খিক-খিক করে হেসে উঠল। ওদের পানের-ছোপ-লাগা মাড়িগুলি আমার কাছে ভয়ঙ্কর ঠেকল।

সাত্তার আমার গাল টিপে দিয়ে চোখ মটকে বলল,—'একেবারে কচি খোকা আছে, মাইরি! মা বকবে!'

লজ্জায় আমার গাল লাল হয়ে গেল।

পাশ থেকে জিত্তে বলল,—'আর একটু খেল না। এই সাড়ে বারোটা অবধি।'

সাড়ে বারোটার পর বাড়ি ফিরলেও মা যথেষ্ট রাগ করবেন। চাই কি সন্ধেবেলা অফিস-ফেরত বাবাকে খুব কড়া করে নালিশ করে দিতে পারেন। কিন্তু এদের হাত থেকে ছাড়া পাব কেমন করে? ব্যাপারটা আমার কাছে আর মোটেই ভাল ঠেকছে না। শুকনো গলায় বললাম,—'সাড়ে বারোটা অবধি। তার বেশী নয় কিন্তু।'

জিত্তে সাত্তারকে আড়ালে চোখ মটকে বলল,—'হাঁ, হাঁ, জরুর, জরুর!'

শুরু হল আবার দান দেওয়া। সাড়ে বারোটার ভোঁ পড়ার কিছুক্ষণ আগেই জিত্তে আবার ফতুর হয়ে গেল। এবারও ওর গুলি আমি আর সাত্তার ভাগাভাগি করে জিতে নিয়েছি। আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। সাত্তার পথ আড়াল করে দাঁড়াল—'কোথায় যাচ্ছ, দেবানন্দ!'

—'বাড়ি।'

'বাড়ি!'—সাত্তার যেন এ-রকম অবাক-করা কথা আর শোনেনি, —'এতো গোলি জিতে নিয়ে তুমি চলে যাবে আর আমরা বসে বসে আসমান চাটব? আমি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে খেলতে হবে।'

—'আমি তো আগেই বলেছি সাড়ে বারোটার সময় ফিরব।'

—'আমার সাথে কুনো কথা হয়নি। আমি ছাড়ব না।'

—'কাল এসে খেলব।'

—'ও সব কুনো বাত শুনতে চাই না। হয় তুমার মূল-সহ সব গোলি দিয়ে যাবে, না হয় যতক্ষণ না একজন শেষ হচ্ছে খেলতে হবে।'

—'এ রকম কথা ছিল না।'

সাত্তার এবার ধমকে উঠল,—'চোপ বে! বেশী বাতেলা মারলে সব কেড়ে লিব!'

আমার মুখের ভেতর তখন একটা তেতো স্বাদ ছড়িয়ে যাচ্ছে। শুকনো থরথরে মুখে রাগ আর হতাশা ছড়িয়ে যাচ্ছে। বুঝছি, আমি একটা জালে জড়িয়ে পড়ছি। আমাকে এরা সহজে ছেড়ে দেবে না। এরা সব চোর ডাকাত ওয়াগন-ব্রেকারদের ঘরের ছেলে। এদের মায়া দয়া মমতা নেই। এদের বাড়ি-ঘরও নেই বোধহয়। থাকলেও সেই বাড়িতে এদের মা ভাত বেড়ে বসে থাকে না বোধহয় এদের জন্য।

সাত্তার আবার ধমক দিল,—'চল্ খেল্! এবার থেকে চোটে আট গোলি, বিল্লাস চার গোলি।'—বলেই ওর দান দিল। আমার মতামতটুকু পর্যন্ত নেওয়া দরকার বোধ করল না। বুঝলাম আমার ঘাড় ধরে এরা খেলিয়ে নেবে। আমাকে একটাও গুলি নিয়ে এরা এখান থেকে বেরুতে দেবে না। খেলে জিততে না পারলে মেরে কেড়ে নেবে।

বেলা দেড়টার সময় আকাশে সূর্য যেন আগুন লাগিয়ে দিল।

একে গরম কালের জামসেদপুর, তার উপর দুপুর দেড়টা। সমস্ত আবহাওয়া যেন খাঁ-খাঁ করছে। চারদিক নিস্তব্ধ, নির্জন। আমরা ছাড়া আশেপাশে আর কোন লোকজনও নেই। শুধু নির্মেঘ নীল আকাশের ভেতর একটা বিষণ্ণ চিলকে একা-একা চক্রাকারে উড়ে বেড়াতে দেখছি। একটা ক্লান্ত বরফওয়ালা এসে বসল দূরের পলাশ গাছটার নিচে। মা এতক্ষণে নিশ্চয়ই পাশের বাড়ির শিবুদাকে ডেকে আমাকে খোঁজ করার কথা বলছেন। মায়ের এখনও স্নান হয়নি, খাওয়া হয়নি। রান্নাঘরের দাওয়ায় আমার ভাত ঢাকা। উঠোনের প্রাচীরের উপর সেদিকে চেয়ে বসে আছে দুটো লোভী কাক। মা ঘর-বার করছেন। পাশের বাড়ির গোপালের মা এসে মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—'ঠিক এসে যাবে দেখবেন। চিন্তা করবেন না।'

মা উদ্বিগ্ন স্বরে বলছেন—'এত দেরি তো কোনদিন করে না দিদি!'

শিবুদা ততক্ষণে বাড়ি থেকে সাইকেল বের করেছে, মাকে জিজ্ঞাসা করল,—'কোন্‌দিকে গেছে কিছু জানেন কাকীমা ?'

—'কি জানি বাবা, কিছু তো বলে যায়নি।'

সাত্তার আমার কাঁধে একটা ঠেলা দিয়ে বলল,—'দেও, দেও, দান দেও!'

হঠাৎ আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। দু-পায়ের উপর রুখে দাঁড়িয়ে বললাম,—'হাম আউর নেহী খেলেগা।'

সাত্তার ঘুরে দাঁড়াল মুখোমুখি,—'তুম নেহী খেলেগা ; তুমারা বাপ খেলেগা!'

একটা তরল আগুনের স্রোত আমার মাথা বেয়ে নিচে নেমে এল। চাপা গরগরে গলায় বললাম,—'খবরদার! বাপের নাম তুললে তোমার জিভ উপড়ে নেব!'

ইতিমধ্যে কখন যেন জিতে-সহ বাকি চারজন ছেলে গাছতলা থেকে উঠে এসে আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে।

সাত্তার আমার আপাদমস্তক একাধিকবার নিরীক্ষণ করল।

তারপর ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে নেভা দেশলাই-কাঠিটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল—'শালা পচা মাচ্ছি বাঙ্গালীর বহুত রঙবাজি ভী আছে!' চারপাশ থেকে সবাই খিক-খিক করে হেসে উঠল।

দাঁতে দাঁত চেপে বললাম,—'আর একটা কথা বললে তোমার দাঁত খুলে নেব!'—আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ পেছন থেকে ঝাঁ করে একটা ঘুসি এসে পড়ল আমার মাথার নিচে, আমি সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে যেতে ঘাড ঘুরিয়ে দেখলাম, আঘাতটা করল জিত্তে। আমার শরীরে ঘৃণার একটা ক্লেদ ছড়িয়ে গেল। এই জিত্তেই কাল আমায় আদর করে ডেকে এনেছিল ওদের পাড়ায়।

সামনের দিকে যখন পড়ে যেতে যেতে টাল সামলাচ্ছি, তখন সামনে থেকে সাত্তার ওর ডান হাতে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল আমার চোয়ালেব নিচে। এই আঘাতটা আর সামলাতে পারলাম না। ঝপ্ করে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম মাটিতে। হাতের মুঠি থেকে আমার পুঁটলিটা ছিটকে গিয়ে সব গুলি ছড়িয়ে গেল মাঠময়। একটি পাঞ্জাবী এবং একটি বিহারী ছেলে দ্রুত সেগুলি কুড়িয়ে নিতে লাগল। সাত্তার আমার চেয়ে প্রায় হাত-দুয়েক বেশী লম্বা হবে। ওর কব্জিতে কতখানি শক্তি ধরে সেটা হাড়ে-হাড়ে টের পেলাম।

আমাকে পড়ে যেতে দেখে ওরা হো-হো করে হেসে উঠল। সাত্তার আমার বুকের উপর একটা পা তুলে দিল, বলল,—'এটা দশ নম্বর বাস্তি, বুঝেছ মাস্টার! এখানে কুনো রঙবাজি চলে না!'

নিচের ঠোঁটটা চিন-চিন করছিল। বাঁ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুছে নিয়ে দেখলাম, রক্ত পড়ছে। বুঝলাম নিচের ঠোঁট দাঁতের ঘষায় কেটে গেছে। রক্ত দেখে আমার শরীরের প্রত্যেকটি শিরা হঠাৎ ধনুকের ছিলার মত টান হয়ে উঠল। এক ঝট্‌কায় বুকের উপর থেকে সত্তারের পা সরিয়ে দিয়ে আমি লাফিয়ে পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালাম। উঠে দাঁড়িয়েই পেছনে ঘুরে জিত্তের চুলের ঝুঁটি ধরে পাক মেরে ওকে মাটিতে ফেলে দিলাম। তারপর ঝুঁটি ধরেই ওকে নিমেষের মধ্যে

কয়েকবার আছাড় দিলাম মাটির উপর। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পেছন থেকে বিহারী ছেলেদুটি আমাকে চেপে ধরল। আমার মুখ তখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত। সাত্তার এগিয়ে এসে দমাদম ঘুসি মারতে শুরু করল আমার মুখের উপর। কয়েকটা ঘুসি খাওয়ার পরই চোখে হলদে তারা ভেসে এল। পেছনের বিহারী ছেলেদুটি আমাকে ছেড়ে দিতেই আমি টলতে-টলতে ঝুপ করে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে গেলাম।

কিন্তু ঠিক পরমুহূর্তেই শুনলাম সাত্তারের কণ্ঠে একটা অস্ফুট গোঙানি। মুখ তুলে দেখি, সত্তারকে কোনাকুনি রেখে প্রায় আমার বয়সীই একটি ছেলে বিদ্যুতের মত আঘাত হানছে তার কানের নিচে আর থুতনিতে। ছেলেটির হাত দেখা যাচ্ছে না, শুধু ওর হাতের বাতাস কাটার শন-শন শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোধহয় কয়েক পলকের ব্যাপার, ছেলেটির চেয়ে হাত-দুয়েক লম্বা মুস্কো জোয়ান সাত্তার একটা বেতস লতার মত মাটিতে টলে পড়ে গেল। ওর পড়া দেখে বুঝলাম, ঘণ্টাদুয়েকের আগে ও আর উঠছে না। কে এই ছেলেটি? হঠাৎ এই আগন্তুকের আগমনে আমরা সবাই মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিলাম। কিন্তু সাত্তার পড়ে যেতেই জিত্তেরা বুঝল ছেলেটি আর যাই হোক ওদের মিত্রপক্ষীয় নয়। ওরা পাঁচজন তখন একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে আসছে ছেলেটির উপর।

আমি এক লহমায় উঠে দাঁড়ালাম মাটির উপর। ছেলেটি দ্রুত আমার পাশে সরে এসে বলল,—'তুমি আমার পেছনটা দেখ।' বলেই ও এগিয়ে গেল। দেখলাম ওর বাঁ হাতে ততক্ষণে উঠে এসেছে ঝকঝকে একটা স্টীলের ফাইভার।

এর পরের মুহূর্ত-কয় জুড়ে ছেলেটি যেন ম্যাজিক দেখাল একটা!

জিত্তে সহ পাঁচটি ছেলের মাঝে ওর দু-হাত যেন কেউটের বিজলী-হানা ছোবলের মত ওঠা-নামা করছিল। আর ওর দেহ যেন প্রজাপতির চেয়েও হাল্কা, বিদ্যুতের চেয়েও বেশী চমক-লাগানো— এইভাবে ও পলকের মধ্যে নিজের স্থান পরিবর্তন করছিল। তাই এই মুহূর্তে যেটা তার পশ্চাৎভাগ চোখের পলক ফেলতেই সেটা তার সম্মুখ

অঞ্চল। যদিও আমাকে সে বলেছিল তার পেছনটা পাহারা দিতে, তবু সেই কটি মুহূর্ত জুড়ে আমাকে কিছুই করতে হল না, শুধু স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম পরের মুহূর্ত-কয়।

নিমেষের মধ্যে কি যেন হয়ে গেল। শুধু বাঁ পা বাড়ানোর কায়দায় সম্মুখবর্তী জিত্তেকে ও টাল খাইয়ে দিল আর জিত্তের ওই মস্ত-বড় শরীরের টালমাটাল অবস্থার সুযোগে ওর ডান হাতের তীব্র ঘুসি এসে পড়ল জিত্তের পাঁজরের নিচে। কট্ করে একটা শব্দ হল, কঁকানো ব্যথায় জিত্তের শরীর কুঁকড়ে উঠল। মুখ উপরে তুলে বোধহয় একটু বাতাস চাইছিল জিত্তে, কিন্তু সে সুযোগটুকু আর ও পেল না। পরমুহূর্তে ওর উঠানো থুতনির নিচে এসে আছড়ে পড়ল ফাইভার-সুদ্ধ হাতের নির্মম আড়াআড়ি আঘাত। মুহূর্তে ঝকঝকে নীল রঙের ফাইভার রক্তে লাল হয়ে উঠল, ঝলকে ঝলকে রক্ত তুলে জিত্তের টালমাটাল দেহ সাত্তারের নিস্পন্দ শরীরের পাশে গড়িয়ে পড়ল।

এ-সব মুহূর্তের ব্যাপার। বোধহয় এক মুহূর্তকে দশ ভাগে ভাগ করলে যতখানি সময় যায়, ঠিক ততখানি সময়ের মধ্যে জিত্তে আর সাত্তার মাটি নিল। আর পরের মুহূর্তটুকুতে আমার বিস্ময় আমাকে এত হতচকিত করে দিয়েছিল যে, যখন আর সময় নেই ঠিক তখন চকিতে দেখলাম, আমাকে ছেলেটি ওর পেছন পাহারা দিতে বলেছিল, অথচ আমি আর ওর পেছনে নেই তখন; আর সেই সুযোগে পেছনের বিহারী ছেলেটি একটা শুকনো গাছের ডাল তুলে আঘাত হানল আমার বিপদ-ত্রাতার মাথার পেছনে।

আমি চোখ বন্ধ করছিলাম, কিন্তু চোখের পলক ফেলা মুহূর্তটুকুও বোধহয় এই ছেলেটি কাজে লাগাতে পারে। সামনের যে ছেলেটিকে তখন সে আক্রমণ করছিল তার চোখে ত্রাসের চিহ্ন দেখেই ও টুক করে মাটিতে বসে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে বিহারী ছেলেটির লাঠি এসে পড়ল সামনের ছেলেটির কাঁধে। এবার ওদের দু-জনের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে ও বিহারী আর মুসলমান ছেলেটাকে সামনে রেখে সরাসরি আক্রমণ চালাল। ওর দু-হাত

বোধহয় কয়েক সেকেণ্ড মাত্র ব্যস্ত ছিল, তারই মধ্যে কাজের কাজ করে গেল ও, পর-পর দুজনে অজ্ঞান হয়ে ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পর-পর চার সঙ্গীর এই অবস্থা দেখে বাকি যে তিনটি ছেলে গুটি-গুটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল, তারা পেছন ফিরে দৌড় দিল বস্তির দিকে। বোধহয় ওদের বাবা দাদাদের ডাকতে। আর ওই মুহূর্তের বিরতিতে ছেলেটি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত গলায় প্রশ্ন করল,—'কোথায় থাক তুমি?'

আমি ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হলাম। আমার চেয়ে কিছুতেই বড় হবে না সে বয়সে, যদিও লম্বায় আমার কিছুটা বড়। কিন্তু পর-পর এই চারটে গুণ্ডা ছেলেকে মাটিতে শুইয়ে দিতে ওর মুখের কোলে একবিন্দুও ঘাম জমা হয় নি। ফুটে ওঠে নি মুখের রেখায় সামান্য একটু উত্তেজনাও।

কিন্তু তখন অবাক হবার সময় নেই। যে-কোন মুহূর্তে ওরা দলবল নিয়ে ফিরে আসতে পারে। আড়ষ্ট গলায় দ্রুত উত্তর দিলাম, —'সিদগোড়া।'

ছেলেটি আমার হাত ধরে টান দিয়ে দ্রুত দৌড়তে শুরু করল কৃষ্ণা রোড ধরে। তারপর দৌড়তে দৌড়তে বলল,—'জামাটা পরে নাও।'

খেয়াল হল, জামাটা তখনও আমার হাতে ধরা। দৌড়তে দৌড়তেই গায়ে জামাটা পরে নিলাম।

—'এদের এখানে এসেছিলে কেন, খেলতে? জান না এরা কেমন? প্রত্যেকটা ছেলে পাজি, গুণ্ডা, জেল-খাটা।'

—'ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু তুমি?'

—'বলব পরে। আজ বিকেলে নবশক্তি সংঘের মাঠে আসবে?'

আমরা তখন আঠেরো নম্বর ক্রস রোড ধরে দৌড়চ্ছি। বললাম,—'আসব।'

একটু বাদে শুধাই,—'তুমি কোথায় থাক?'

—'এগ্রিকো।'

এগ্রিকো আমাদের পাশের পাড়া। আমরা তখন বারোয়ারিতলার মাঠে এসে পড়েছি। এখানে এসে থামলাম। আমি এবার মেন রাস্তা পার হয়ে বাড়ি যাব। ছেলেটি পাঁচ নং রোড ধরে এগ্রিকো চলে যাবে বুঝলাম। তাই যাওয়ার আগে আমরা দুজনেই থামলাম মুখোমুখি। ছেলেটি মুহূর্তকয় কি যেন ভাবল মনে মনে, তারপর দ্রুত গলায় প্রশ্ন করল,—'তোমার নাম কী?'

আমি আমার নাম বললাম। তারপর আমি প্রশ্ন করলাম,—'তোমার নাম?'

-'অমল।'—বলেই ছেলেটি পাঁচ নম্বর রোড ধরে তীরের মত ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ওর ছুটে যাওয়া দেখলাম। তারপর আমিও মেন রাস্তা পার হয়ে বাড়ি পৌঁছলাম।

আমাদের বাড়ির দরজার কাছে মিতুর মা দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে রাস্তা পার হয়ে আসতে দেখেই বাড়ির ভেতর ঢুকে গিয়ে বললেন,—'এই যে দিদি, আপনার শ্রীমান এসে হাজির।'

আমি শুনতে পেলাম ঘরের ভেতর থেকে মা কেমন ভাঙা কিন্তু ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করলেন,—'কই?'

গেটের কাছে সাইকেল হাতে দাঁড়িয়েছিল শিবুদা। আমাকে প্রশ্ন করল,—'কোথায় গেছলি রে তুই? এদিকে তোর মা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন। তোর যে আর কবে বুদ্ধিশুদ্ধি হবে!'

কোথায় গেছিলাম সে কথার উত্তর শিবুদাকে না দিয়ে আমি তীরের মত ছুটে ঘরের চৌকাঠে এসে থমকে দাঁড়ালাম। মা খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে মেঝেয় বসে ছিলেন। পাশে গোপালের মা, বোধহয় এতক্ষণ মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। মায়ের দু-চোখ ভর্তি শুধু জল। মায়ের চোখে জল আমি একদম সহ্য করতে পারি না। আমার মায়ের যে চোখের জল ফেলাবে আমি তাকে ধ্বংস করে দেব।

আমি ঘরে ঢুকতেই মা আমার রক্ত-ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে

চমকে উঠলেন। আমি মায়ের চমকে ওঠা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। চৌকাঠ থেকে দৌড়ে গিয়ে মায়ের কোলে উপুড় হয়ে পড়লাম। আঃ, কী আরাম! মায়ের কোলে মুখ গুঁজে চাপা ফিসফিস স্বরে বললাম,—'মা, মা, বিশ্বাস কর আমি আর কোনদিন গুলি খেলব না! আর কোনদিন তোমার অবাধ্য হব না! দেখো তুমি!'

নাঃ, আমি একটুও কাঁদিনি সেদিন। আমি তো তখন রীতিমত বড় ছেলে। ক্লাস সিক্সের ছেলেরা কী কাঁদে? তবে কিনা যে ক্লাসেই পড়ি, মায়ের কোলে মাথা গুঁজলে কখন জানি, কেন জানি আপনা থেকেই চোখ জ্বালা-জ্বালা করে আসে। তাই না?

খেতে বসে মাকে সব কথা বলেছি। মা বলেছেন আজ বিকেলে দেখা হওয়ার পর অমলকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসতে। দুপুরে একফাঁকে গুলিভর্তি পিউরিটি বার্লির কৌটোগুলি পেছনের মাঠে দূর ছাই করে ফেলে দিয়ে এসেছি। আর কী আশ্চর্য, ওগুলি ফেলে আসার পরই আজ দুপুরে আমার পড়ায় কী সুন্দর মন বসল! গ্রীষ্মের ছুটিতে করতে দেওয়া সবকটা সুদকষার অঙ্ক কেমন চটপট করে ফেললাম আমি। মনে হচ্ছে যেন অনেকদিনের একটা ভারি বোঝা শরীর থেকে নেমে গেল। টাইফয়েডের পর প্রথম যেদিন স্নান করা যায় সে-দিন গা-টা যেমন ঝরঝরে লাগে আজ দুপুর থেকে আমার মনও তেমন ফুরফুরে হাল্কা হয়ে উঠল।

॥ তিন ॥

নবশক্তি সংঘ জামসেদপুরের বিখ্যাত ক্লাব। আমি কিন্তু কোনদিন এই ক্লাবে যাইনি। মাঠের ধরাবাঁধা নিয়ম আমার ভাল লাগত না। খেলার সময় মাথার উপর একজন মাস্টার খবরদারি করবে এটা আমি কেমন সহ্য করতে পারতাম না। তাই মাঠে মাঠে ছাড়া গরুর মত চরে বেড়াতাম পকেটভর্তি রয়েল গুলি নিয়ে। কিন্তু আজ এই প্রথম মাঠে এসে আমার খুব কষ্ট হল। মনে হল আমি কী বোকা ছেলে!

প্রথমে ক্লাবের ছেলেমেয়েরা সব একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আধঘন্টা

পি. টি. করে শরীর ঝরঝরে করে নিল। তা কম করেও শ-পাঁচেক ছেলেমেয়ে তো হবেই। কালো রোগা-মত চশমা-পরা একজন লোক দূরের এক কোণায় দাঁড়িয়ে ইন্সট্রাকশন দিচ্ছেন। কী গমগমে তাঁর গলা! তাঁর প্রতিটি কথা মাঠের এ কোণ থেকে ও কোণে শোনা যাচ্ছে। এই পাঁচশো ছেলেমেয়ে একতালে তাঁর কথা-মত হাত-পা নাড়ছে। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে খুব সুন্দর লাগল। পরে জেনেছি ওই ভদ্রলোকের নাম গাঙ্গুলীদা। গাঙ্গুলীদা কি এই পাঁচশো জনকে পাঁচশো একজন করতে পারেন না?

পি. টি.-র পর ছেলেমেয়েরা দলে-দলে ভাগ হয়ে গেল। মেয়েদের কোন দল গেল বেসবল খেলতে, কোন দল গেল রিং খেলতে আবার কোন দল গেল ভলিবল খেলতে। আর বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা ভাগ হয়ে গিয়ে এক-একটা ফুটবল নিয়ে চলে গেল বিভিন্ন মাঠে। প্রত্যেক দলের সঙ্গে গেল একজন করে মাস্টার খেলার রেফারি হতে। কী সুষ্ঠু নিয়ম-শৃঙ্খলা!

আমি স্বপ্নের মতই কতক্ষণ অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ পেছন থেকে কাঁধে চাপ পড়তে চমকে ফিরে দেখি, অমল। ভোরের ফোটা ফুলের মত একরাশ হাসি ওর মুখে।

—'কখন এসেছিস? আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল, না?'

দ্বিতীয় আলাপেই 'তুমি' থেকে একেবারে 'তুই'তে নেমে এল অমল।

—'এই কিছুক্ষণ। তুই এই ক্লাবে খেলিস?'

—'হ্যাঁ। তুইও খেলবি। আমি বক্সিং শিখি। আমাদের বক্সিং কে শেখায় জানিস? ছানিদা। জামসেদপুর চ্যাম্পিয়ান। আয়।' —অমল আমার হাত ধরে টানে।

আমি আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। ছানিদার নাম কে না জানে? আমাদের চোখে দেবদূতের মত শক্তিশালী ছানিদা। ছানিদাকে শুধু দূর থেকে দেখেছি আমি। সেই ছানিদা হাতে ধরে বক্সিং শেখাবেন আমাকে! যাঃ, কখনই নয়! আমি মাঠে মাঠে

গুলিজিত খেলে বেড়াই। আমার সঙ্গী সস্তার জিত্তের মত পাজি গুণ্ডা ছেলেরা। ছানিদা আমার মত একটা বাজে ছেলেকে ক্লাবে নেবেন কেন?'

অমল আমায় ঠেলা দিল—'কি রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আয়।'

আমি আড়ষ্ট গলায় প্রশ্ন করলাম,—'আমায় নেবে?'

অমল অবাক হল,—'নেবে মানে! নেবে না কেন রে? আয় আয়, ইনডোরে আমাদের প্র্যাকটিস হয়।'

অমল আমার হাত ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে চলল ক্লাব-ভবনের দিকে। কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। অমল প্রশ্ন করল,—'কী হল?'

—দুপুরের ব্যাপারটা কিন্তু এখনও জানতে পারিনি।'

—'দুপুরের ব্যাপার মানে!'

—'তুই হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে আমাকে উদ্ধার করলি?'—অমলের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলাম।

কথা শুনে অমল হা হা করে হেসে উঠল। পরে অমলের এমন হা হা হাসির অনেকবার মুখোমুখি হয়েছি আমি। যখনই ওর কোন কৃতিত্বের কথা এসে পড়ে ও এভাবে হা হা করে হেসে সেটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

—'উদ্ধার আবার কী! টিনপ্লেট কারখানায় বাবাকে দুপুরের টিফিন পৌঁছে দিয়ে ফিরছিলাম ওই রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ দেখলাম তোকে ওরা সবাই ঘিরে ধরে মারছে। ব্যাপারটা খারাপ লাগল। ওই ছেলেগুলিকে আমি চিনি। ভয়ঙ্কর পাজি ওরা। গায়ের রক্ত গরম হয়ে গেল। ছানিদার কাছে বক্সিং শিখছি বছর-খানেক। সেটা একটু কাজে লাগাবার সুযোগ খুঁজছিলাম। দেখতে চাইছিলাম সত্যিই কতটা উপকারে আসে। ব্যস, তার পরের ব্যাপার তো তুই জানিস।'

যেন ব্যাপারটা ওইটুকুই, এর বেশী কিছু নয়, এইভাবে শেষ করে অমল আমাকে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে চলল ক্লাব-ভবনের ভেতর।

ভেতরে এক এলাহি কাণ্ড! বিশাল এক হলঘরের ভেতরে মহড়া

চলেছে। মাঝখানে বক্সিং রিং। রিং-এ দুজন ছেলে প্র্যাকটিস করছে। রিং-এর এক পাশে দাঁড়িয়ে ছানিদা উৎসাহিত করছেন দুজনকেই। হলঘরের চারধারের বালির বস্তায় ঘুসি চালিয়ে কব্জির জোর বাড়াচ্ছে গোটা-পনেরো বিভিন্ন বয়সের ছেলে।

অমল আমাকে একেবারে সরাসরি ছানিদার কাছে টেনে নিয়ে গেল। দুর্ধর্ষ বক্সার ছানিদা যে ভেতরে ভেতরে এত ভাল লোক তা কি আগে জানতাম! অমল পরিচয় করিয়ে দেওয়া-মাত্র ছানিদা আমার কাঁধ খামচে ধরে কাছে টেনে নিলেন।

—'একে কোথায় জোগাড় করলি রে, অমল! এ-রকম একটি ছেলেকেই আমি সারা জীবন খুঁজছিলাম! কী চওড়া কাঁধ দেখেছিস? এর এক-একটা ঘুসির ওজন থ্রি-নট-থ্রি-র বুলেটের সমান হবে।'

—'কেমন এনেছি বলুন!'—অমল গর্বের হাসি হাসল—'আর এ বলে কিনা ওকে ক্লাবে ভর্তি করবে তো!'

ছানিদা চোখ কপালে তুললেন,—'ভর্তি করবে না মানে! কে করবে না?'

তারপর? তারপর আর কী? যার অমলের মত বন্ধু আছে আর ছানিদার মত গুরু আছে তার জীবন এরপর কেমন কাটবে সেটা বলে বোঝাতে হয় না। ক্লাব সেক্রেটারির থেকে ভর্তির ফর্ম চেয়ে সেখানে বসেই ফর্ম ভর্তি করে দিলেন ছানিদা, তারপর বললেন,—'এইখানে তোর বাবাকে দিয়ে কাল একটা সই করিয়ে আনবি। ভর্তি হতে এক টাকা, তারপর মাসে মাসে আট আনা চাঁদা। আর কাল থেকে ঠিক বিকেল চারটেয় এখানে হাজিরা দেওয়া চাই, বুঝলি? দেরি হলেই এক ঘুসিতে নাক ভেঙে দেব!'—এই বলে ছানিদা হো হো করে হেসে উঠলেন।

ক্লাব-সেক্রেটারি রমেনদা বসে ছিলেন টেবিলের উল্টোদিকে। বললেন,—'এই ছানি, দেখছ কতটুকু ছেলে, ওকে ওভাবে ভয় দেখাতে আছে?'

বুঝলাম চোখ কপালে তোলা ছানিদার মুদ্রাদোষ। চোখ কপালে

তুলে ছানিদা বললেন,—'ভয় আপনি কাকে পেতে দেখলেন! একে? এ ভয় পাওয়ার ছেলে। তবে একে খুব চিনেছেন আপনি!'—এই বলে ছানিদা আবার স্বভাবসুলভ হো হো করে হেসে উঠলেন ঘর কাঁপিয়ে। রমেনদা আর অমলও যোগ দিল সেই হাসিতে।

সেদিন সন্ধ্যায় যেন হাওয়ায় সাঁতরে বাড়ি ফিরলাম। হ্যাঁ, সঙ্গে অমলও আছে। অমলকে যে মা দেখতে চেয়েছেন। দেখা হওয়ামাত্র অমল মাকে প্রণাম করল। মা অমলকে বুকে টেনে নিয়ে চিবুক ছুঁয়ে চুমু খেলেন। অমলটার একটুও লজ্জা নেই, মা আমাকে সবার সামনে বুকে জড়িয়ে ধরলে লজ্জায় আমি মাথা তুলতে পারি না। তা লজ্জা দূরে থাক উল্টে অমল দাঁত দেখিয়ে বেহায়ার মত বলল,—'ওকে দেখছেন, মাসিমা? কেমন রেগে-মেগে আমার দিকে চেয়ে আছে! যেন ওর মাকে আমি কেড়ে নিচ্ছি!'

আমি বোকার মত তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম,—'যাঃ, মোটেও নয়। আমি এখন আর মায়ের আদর খাওয়ার মত ছোটটি নই।'

আমার বলার ভঙ্গীর মধ্যে বুঝি সত্যি-সত্যি কিছু ছেলেমানুষী ছিল, শুনে মা আর অমল দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

আমার মায়ের মত পায়েস আর কারো মা রাঁধতে পারেন না। মা সেদিন পায়েস করেছিলেন। আমাকে আর অমলকে পাশাপাশি বসিয়ে মা পায়েস খাইয়েছিলেন সেই প্রথম দিন।

॥ চার ॥

সেই শুরু অমলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব।

সব জিনিসের যেমন শুরু আছে, শেষও আছে তেমন। কিন্তু বন্ধুত্বের বুঝি শুধু শুরুই আছে, শেষ নেই। অন্তত আমার তাই মনে হত।

কী ব্যস্ততায়ই না কেটেছিল আমাদের জামসেদপুরে স্কুলজীবনের শেষ কটা দিন। শুধু কি ব্যস্ত, সুন্দর নয়? মুগ্ধ বিভোর হয়ে যাবার মত নয়? থমকে থেমে আনমনা হয়ে গিয়ে স্মৃতিচারণ করার মত নয়?

রোজ বিকেল চারটেয় আমরা হাজিরা দিতাম ছানিদার আখড়ায়। ছানিদা ছিলেন অদ্ভুত ক্ষ্যাপাটে ধরনের লোক। আমাদের তাঁর নিজের ছেলের মত ভালোবাসতেন। বলতেন,—'জানিস, এই পৃথিবীতে বড় হতে হলে প্রত্যেকের দুটো করে বাপ দরকার,—একজন নিজের বাবা যে লালন-পালন করে বড় করে তুলবে, আর একজন ধর্মবাবা, গড-ফাদার—যে পৃথিবীর ঝড়ঝাপটা থেকে তাকে রক্ষা করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবে।'—বলতে বলতে ছানিদা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন, তারপর কেমন বিষণ্ণ মুখে বলতেন,—'জানিস, এই পৃথিবী ভীষণ খারাপ জায়গা! বড় হয়ে দেখবি, যে মানুষের একটু ক্ষমতা আছে সে-ই কেমন শয়তান হয়ে উঠেছে। দেখবি, তুই যদি এক ইঞ্চি বড় হতে চাস তবে দশটা ক্ষমতাবান পা এগিয়ে এসে তোর মাথায় চাপ দিয়ে তোকে দশ ইঞ্চি মাটির ভেতর ঢুকিয়ে দেবে।'

এরপর ছানিদা সারা মুখে কেমন একটা হলুদ রঙের হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলতেন,—'তা তোরা বড় হওয়ার চেষ্টা করবি, না এই সব পায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবি? দুটো জিনিস একসঙ্গে হয় না। তোরা বড় হবি, আর আমি তোদের হয়ে সেই পা-গুলোর সঙ্গে লড়াই করব। তোদের বুকে করে আড়াল করে রাখব। আমি তোদের ধর্মবাপ।'

ছানিদা ছিলেন রোগা, লম্বা-মতন। মুখের চোয়াল ভাঙা, হনুর হাড়দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইত। কালো ছোট ছোট চোখ ছিল গর্তে ঢোকানো। অথচ ওই ছোট কালো চোখদুটো দিয়েই আমাদের জন্য তাঁর কত মায়া আর মমতা ঝরে পড়তে দেখেছি। পরে আস্তে আস্তে জানতে পেরেছি, জীবনে ছানিদা অনেক অন্যায় অনেক অবিচারের শিকার হয়েছেন। ছানিদার একরোখা জেদী চরিত্রের জন্যই বক্সিং কর্তৃপক্ষের উচ্চমহলের সঙ্গে তাঁর কোনদিন বনিবনা হয়নি। ফলে ছানিদাকে কোনদিন জামসেদপুর ডিঙিয়ে রাজ্য পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় পর্যন্ত যেতে হয়নি। অথচ সে সময় যারা

রাজ্য পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ান হচ্ছে তারা প্রত্যেকে অন্তত ছুবার করে হলেও ছানিদার কাছে নক-আউট হয়েছিল।

ছানিদা এক-একদিন বক্সিং অনুশীলন শেষে, আকাশে যখন সন্ধ্যার ম্লান ছায়া ঘনিয়ে আসত, তখন বলতেন,—'এর জন্য আমি ছুঃখ করি না, জানিস। আমি বক্সিং-এ খুব একটা বড় প্রতিভা নই। বক্সিং-এ বিরাট একটা ন্যাক ছিল তাই শিখেছি, এখনও ছাড়তে পারছি না। কিন্তু ছুঃখ কোথায় জানিস, এই ধরনের ঝগড়ায় যখন সত্যিকার প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়। কোনদিন জেলা ডিঙিয়ে রাজ্য পর্যায়ে আসতে পারে না। নিরুৎসাহ হতে হতে একসময় তারা 'ধুত্তোরি' বলে সব ছেড়ে-ছুড়ে দেয়। আমাদের সময় অ্যালবার্ট গোমেশ ছিল এমন এক প্রতিভা। অথচ বেচারাকে কোনদিন জামসেদপুর প্রতিযোগিতায় অবধি ডাকা হল না।'

কেমন একটা হতাশার ভঙ্গীতে নিশ্বাস ফেলতেন ছানিদা। আমরা তাঁর গুটিকয় প্রিয় ছাত্র তাঁকে ঘিরে বসে থাকতাম, কেমন একটা শান্ত বিষণ্ণতা এসে আমাদেরও আক্রমণ করত। আমরা ঘাড় হেঁট করে বসে থাকতাম।

আমাদের ওভাবে বসে থাকতে দেখে ছানিদা আবার উৎসাহ উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটে উঠতেন,—'আরে আরে তোদের মন খারাপ করার কী আছে রে বোকা ছেলে! তোদের কিচ্ছু হবে না। আমি থাকতে তোদের গায়ে আঁচড়টুকু অবধি পড়বে না, দেখে নিস।'

আমার কেমন ইচ্ছা করত, হাত বাড়িয়ে ছানিদার রোগা-রোগা শিরা-উঠা পা ছুটো খপ করে ধরে একটা প্রণাম করি। কিন্তু লজ্জায় হাত উঠত না।

এমনি যেমন তেমন, কিন্তু প্র্যাকটিসের বেলায় ছানিদা রাক্ষসের মত নিষ্ঠুর। আমাদের মুখে রক্ত তুলে ছাড়তেন। ভোর চারটেয় ছোলা চিবুতে-চিবুতে ক্লাবে যেতাম। অমল তার আগেই এসে পৌঁছত আমাদের বাড়িতে। তারপর টানা ছ-ঘণ্টা ছ-টা অবধি চলত স্কিপিং করা।

ছানিদা বলতেন,—'এই স্কিপিংটাই বক্সিং-এর সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার। বক্সিং করতে অসম্ভব দম দরকার হয়। বক্সিং জেতে লোকে স্রেফ দমে। আর এই স্কিপিং-এই দম বাড়ে। সাধারণ লোকে ভাবে এ তো আর ফুটবল খেলা নয় যে, অতবড় মাঠ জুড়ে ছুটোছুটি করতে হবে, তাই দম লাগবে। ওই তো সামান্য ছোট একটা রিং-এ মিনিট দুয়েকের খেলা, এতে আবার দম লাগে কিসে। কিন্তু ধারণাটা একদম ভুল। আসলে বক্সিং-এ মনের উপর ভীষণ চাপ পড়ে। আর সেই চাপ দূর করতে হলে চাই দম। মনে রাখিস সব সময়।'

স্কিপিং থেকে নেমে আসতাম ক্লান্তিতে টলতে টলতে। কিন্তু ছানিদার হাতে নিস্তার নেই, সঙ্গে সঙ্গে বালির বস্তার কাছে ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে দিতেন। হৈ-হৈ করে বলতেন,—'বক্সিং-এ ছুটি নেই। প্র্যাকটিস কর, প্র্যাকটিস কর!'

এক-ঘণ্টা প্র্যাকটিস করার পর, ছানিদা তখন হাতে-কলমে বক্সিং-এর টেকনিক শেখাতেন আমাদের। আর সবার শেষে পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বক্সারদের জীবন, তাঁদের সংগ্রাম ছানিদা গল্প করে শোনাতেন আমাদের। তাঁদের গল্প শুনতে শুনতে মনে উত্তেজনা বোধ করেছি। পরে একসময় বুঝেছি, আসলে ছানিদা যত বড় না বক্সার, তার চেয়ে অনেক বড় ট্রেনার। ছানিদা জাত ট্রেনার, ট্রেনার হওয়ার জন্যই ছানিদার জন্ম। আমাদের ভাগ্য আমরা ছানিদাকে ট্রেনার হিসাবে পেয়েছিলাম।

॥ পাঁচ ॥

অমল পড়ত আমার চেয়ে এক ক্লাস উপরে, ক্লাস সেভেনে। হাই স্কুলে উঠে আমরা কিন্তু একই স্কুলে ভর্তি হলাম—আর. ডি. টাটা হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে।

আমার আর. ডি. টাটা স্কুলে ভর্তি হওয়ার পেছনে একটা কাহিনী আছে। আমি আর অমল আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম হাই স্কুলে উঠে আমরা আর. ডি. টাটায় ভর্তি হব। সেইমত সেভেন

থেকে এইটে উঠেই অমল ওই স্কুলে চলে গেল। আর. ডি. টাটা জামসেদপুরের সবচেয়ে নামকরা স্কুল। খুব ভাল ছেলে না হলে এই স্কুলে ভর্তি হওয়া যায় না। কিন্তু পরের বার সেভেন থেকে এইটে উঠতে কেন জানি না আমার পরীক্ষার নম্বর খুব ভাল হল না। অন্তত আর. ডি. টাটায় ভর্তি হতে যত নম্বর দরকার তত ছিল না।

আমি ভেঙে পড়লাম,—'না রে অমল, তোর সঙ্গে এক স্কুলে পড়ার ভাগ্য আমার নেই!'

অমল ভ্রুক্ষেপহীনভাবে হেসে বললে,—'তুই চুপ করতো! দেখি তুই আর. ডি. টাটায় কেমন ভর্তি হতে না পারিস!'

কথাটা যে শুধুই কথার কথা নয় সেটা বোঝা গেল কয়েকদিন পরই। এর-পর অমল যে ভেল্কিটা দেখাল তা বুঝি ওই অমলের পক্ষেই সম্ভব। বুঝলাম, অমলকে চেনা আমার কম্ম নয়। এই ছেলে ভবিষ্যতে আরো অনেক ভেল্কি দেখাবে।

এক সপ্তাহ পর আর. ডি. টাটার প্রিন্সিপ্যাল মিঃ. সি. সিং-এর কাছ থেকে বাবার কাছে ছোট্ট একটা চিঠি এল। তাতে লেখা: 'আপনার ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করতে আমরা আগ্রহী। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে কর্তৃপক্ষ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।'

চিঠি পেয়ে বাবা যেমন অবাক, তার চেয়ে বেশী অবাক আমি নিজে। কী হল ব্যাপারটা! খোদ প্রিন্সিপ্যাল চিঠি পাঠিয়ে আমাকে ভর্তি করতে চাইছেন!

সেদিনই দুপুরবেলায় বাবা গিয়ে আমাকে ভর্তি করে এলেন আর. ডি. টাটা স্কুলে। আর ভর্তি হতে গিয়েই প্রিন্সিপ্যাল রহস্যটা ভাঙলেন বাবার কাছে।

আর. ডি. টাটা স্কুলের গেম টিচার হলেন আবদুল গনিসাহেব। গনিসাহেবের মতে আগামী দু-বছরে 'বিহার ইন্টার স্কুল বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপ' জিতে এসে যে স্কুলের মুখ চিরদিনের মত উজ্জ্বল করবে সে অমল বোস। আর. ডি. টাটার ইতিহাসে আজ অবধি কেউ স্কুল বক্সিং-এর চ্যাম্পিয়ানশিপ খেতাব আনতে পারেনি। ফুটবল,

ক্রিকেট, ভলিবলে পেয়েছে অনেকবার, কিন্তু বক্সিং-এ একবারও নয়। পাটনার সার্ভিসেস স্কুলের ছেলেরাই সব জিতে নিয়ে যায়। কিন্তু গনিসাহেবের ধারণা, অমলই পারবে সেই অসাধ্য সাধন করতে। গনিসাহেবের চোখের মণি অমল।

কিন্তু সেই অমলই নাকি গনিসাহেবকে গিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাতটা দিয়েছে,—'না স্যর, এই স্কুলে আমার আর পড়া হল না। আপনি আমাকে একটা স্কুল লীভিং সার্টিফিকেট পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। অন্য স্কুলে ভর্তি হব।'

গনিসাহেব আঁতকে উঠেছেন,—'কাঁহে বেটা, কাঁহে!'

—'না স্যর, আমার প্র্যাকটিস নষ্ট হয়ে যাবে।'

—'প্র্যাকটিস নষ্ট হয়ে যাবে! সে কি কথা? কেন নষ্ট হবে?'

—'স্যর, আমার প্র্যাকটিস পার্টনারই যদি এই স্কুলে ভর্তি হতে না পারল তবে আর আমি এখানে মিছিমিছি থেকে কী করব? আর আমার পার্টনার, স্যর, যে-সে ছেলে নয়, ইণ্টার স্কুল চ্যাম্পিয়ানশিপ জিতে আনার ক্ষমতা সেও রাখে।'—বলে অমল পকেট থেকে ফস্ করে ছানিদার দেওয়া আমার এক লম্বা প্রশংসাপত্র বের করে দিয়েছে গনিসাহেবের হাতে।

প্রশংসাপত্র পড়তে পড়তে গনিসাহেবের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। চিঠি পড়া শেষ হলে গনিসাহেব বলেছেন,—'ঘাবড়াও মাৎ, বেটা। তুমি এই স্কুল ছেড়ে চলে গেলে আমিও চলে যাব। আমার চিরদিনের স্বপ্ন ইণ্টার স্কুল বক্সিং জেতা। দেখি আমি কী করতে পারি।'

এরপর গনিসাহেব যা করেছেন সেটা বুঝি এক ধরনের খেলা-পাগল লোকের পক্ষেই করা সম্ভব। গনিসাহেব এক হাতে আমার ভর্তির আবেদন-পত্র ও ছানিদার প্রশংসাপত্র আর অন্য হাতে নিজের ইস্তফাপত্র নিয়ে দেখা করেছেন প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে।

অগত্যা প্রিন্সিপ্যাল আর কি করেন!

কিন্তু গনিসাহেবের ঋণ আমি শোধ করে দিয়েছি ভর্তি হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে। ভর্তি হয়ে সেই বছরই আমি জুনিয়ার ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ানশিপ জিতে আনলাম।

আর অমল ?

অমল তখন এক-এক করে গড়ে তুলছে ওর সাফল্যের ইতিহাস। ছানিদা বলেন,—'ইতিহাস নয় রে। অমল ওর সাফল্যের পিরামিডে কয়েকটা ইট এনে জমা করেছে মাত্র। দেখিস, অমল আরো অনেক বড় হবে। ওর মাথা একদিন পিরামিডের মত আকাশ ছোঁবে। সেদিন ঘাড় উঁচু করেও ওকে আমরা দেখতে পাব না।'

লজ্জা পেয়ে অমল বলেছে,—'যাঃ ছানিদা, আপনি বড্ড বাজে কথা বলেন।'

টেন, ইলেভেনে—পর-পর দুবার রাজ্য স্কুল বক্সিং চ্যাম্পিয়ান হল অমল। টুয়েলভে উঠে এবার যদি আবার চ্যাম্পিয়ান হতে পারে তবে পর-পর তিনবার চ্যাম্পিয়ান হবার এক অনন্য রেকর্ড গড়তে পারে অমল। প্রিন্সিপ্যাল, গনিসাহেব, ছানিদা আর আমরা জানি অমল এবারও চ্যাম্পিয়ান হচ্ছে। কেননা, গতবারে যে অমল পাটনা গিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে আর এবার দানাপুরের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে যে অমল তারা দুজন যেন ভিন্ন লোক। গনিসাহেব তো বলে বেড়াচ্ছেন,—'অমল এবার প্রত্যেকটা লড়াই, এমন কি ফাইন্যালও সরাসরি নক আউটে জিতবে।'

অমল তৈরিও হচ্ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। পড়া আর বক্সিং, এ দুটোতে অমলের কোন ফাঁকি নেই।

কিন্তু অমলের এই এত বড় সম্মান অর্জনের পথে শেষ পর্যন্ত বাধা হয়ে দাঁড়ালাম আমি নিজেই। আমিই যেন ওর শনি, আমার জন্যই অমল এমন একটা সুযোগ হারাল যা আর কোন দিন ফিরে আসবে না ওর জীবনে। এই ক্ষতি কোন দিনই আর কোন ভাবেই পূরণ করে দেওয়া সম্ভব নয়।

ক্লাস ইলেভেনে আমাদের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার ঠিক পরে-পরেই আমার এক সঙ্গেই টাইফয়েড আর ম্যানেনজাইটিস হল। অমলদের

টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমার যেদিন জ্বর ধরা পড়ল, ঠিক তার দুদিন পর দানাপুরে এই বছরের বিহার স্কুল বক্সিং প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। ঠিক ছিল প্রতিযোগিতা সামনে থেকে দেখে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এবার আমিও যাব দানাপুরে। কিন্তু বিধি বাম, ঠিক তিনদিন আগে আমি অসুখে পড়লাম।

কিন্তু বিধি যে অমলের কপালেও বাম হয়ে ঝুলছিলেন সেটা অজ্ঞান হবার আগে পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। পরে ভাল হয়ে উঠে মায়ের মুখে শুনেছি। যেদিন রাত সাতটার এক্সপ্রেসে ওদের দানাপুর রওনা হওয়ার কথা সেদিন সকাল থেকে আমার আর জ্ঞান ছিল না। সকাল নটায় সার্জনরা সিদ্ধান্ত নিলেন, আজ রাতের মধ্যে আমার অবস্থা ভালো না হলে কাল সকালে আমার ঘাড়ে অপারেশন হবে। এরপর অমল হাসপাতালে সেই যে এসে আমার বেডের পাশে বসেছে তারপর তিন দিন ওকে কেউ আর ওখান থেকে ওঠাতে পারেনি।

বিকেল ছটায় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন গনিসাহেব নিজে আর স্বয়ং প্রিন্সিপ্যাল :

—'অমল, আজকের ট্রেন মিস করলে কালকের ফাইটে তুমি যোগ দেবে কী করে?'—গনিসাহেবের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন।

—'কালকের ফাইটে আমি লড়ছি আপনাকে কে বলল?'

প্রিন্সিপ্যাল চমকে উঠেছেন,—'পাগলের মত কথা বলো না, অমল। দিস ইজ ইয়োর কনজিকিউটিভ থার্ড ইয়ার অ্যাণ্ড ইউ ডোণ্ট মীন টু মিস দিস গ্লোরিয়াস চান্স!'

—'স্যর, এর-পর সারা জীবনই তো আমাকে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। একটাতে না-হয় নাই লড়লাম।'

গনিসাহেব কাতর কণ্ঠে বলেছেন,—'অমল, তুমি নিজের দিকটা না ছাখো না দেখলে, কিন্তু স্কুলের কথা বিবেচনা করেও অন্তত · '

—'স্যর, আমার বন্ধুর কাল সকালে অপারেশন, আর আজ আমাকে ট্রেন ধরতে বলছেন? আপনারা মনে করছেন কাল গিয়ে

আমি ওখানে লড়তে পারব? তার চেয়ে বরং আমার মরা লাশ নিয়ে গিয়ে দানাপুরের রিং ফেলে দিন, সে লড়বে।'

এরপর আমার বাবা অমলকে বোঝাতে গেছেন। কিন্তু অমলের সেই এক গোঁ: না, সে তার বন্ধুর শিয়র ছেড়ে এক পা যাবে না।

প্রিন্সিপ্যাল শেষ বারের মত চেষ্টা করেছেন,—'অমল, ডোণ্ট বি সেন্টিমেণ্টাল। পরখ করার জন্য ভগবান অনেক সময় আমাদের অনেক ডেলিকেট পরীক্ষার সামনে ফেলে দেন, মনে রেখো বড় হতে হলে সেন্টিমেণ্ট নয়, যুক্তি দিয়ে সেইসব পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি তোমার বন্ধুর পাশে থাকব আনটিল ইউ রিটার্ন। অ্যাণ্ড আই উইল অ্যাফোর্ড হিম দি বেস্ট পসিবল মেডিক্যাল কেয়ার অ্যাভেলেবল ইন জামসেদপুর। তোমার বন্ধুর চিকিৎসার কোনরকম ত্রুটি হবে না। তা ছাড়া তোমার বন্ধু লেখায়-পড়ায় খেলায়—সব দিকেই আমাদের স্কুলের রত্ন। ভেবো না ওকে আমরা তোমার চেয়ে কম ভালোবাসি।'

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বলেছে,—'থাক না, ও যখন যেতে চাইছে না তখন কেন ওকে জোর করছেন?'

প্রিন্সিপ্যাল ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করেছেন—'কে ইনি?'

অমল ছুটে গিয়ে লোকটিকে জড়িয়ে ধরেছে,—'ইনি আমার বাবা। ধর্মবাবা, গড-ফাদার!'

তারপর আর প্রিন্সিপ্যালের মুখে কোন কথা জোগায়নি।

কিন্তু পরে ভাল হয়ে উঠে এই নিয়ে অমলের সঙ্গে আমার একচোট হয়ে গেছে। বলেছি,—'না অমল, এইভাবে চিরদিনের জন্য আমাকে একটা গ্লানিবোধের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা চলবে না!'

—'গ্লানিবোধ? গ্লানিবোধ আবার কি রে!'—অমল যেন খুবই অবাক হয়েছে।

—'গ্লানি নয়! আমার জন্যই তুই পর-পর তিনবার চ্যাম্পিয়ান হতে পারলি না!'

—'তোর জন্য!'—অমল প্রথমটা অবাক হয়েছে, তারপর আমার

চোখের উপর চোখ রেখে অস্ফুট বিড়-বিড় স্বরে বলেছে—'তুই পারতিস? আমার জায়গায় তুই থাকলে তুই পারতিস আমায় ফেলে যেতে?'

এর-পর আর কথা চলে না। আমাকে ঘাড় নিচু করে চুপ করে যেতে হয়েছে।

হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে অমল চলে গেল কলকাতার কলেজে। টুয়েলভে উঠে আমি বিহার ইণ্টার স্কুল বক্সিং জিতে এসে প্রিন্সিপ্যাল আর গনিসাহেবের গত বছরের আপসোস হয়ত কিছুটা কমাতে পেরেছিলাম।

পরের বছর পাশ করে আমিও চলে এলাম কলকাতায়। ভর্তি হলাম অমলের সঙ্গে এক কলেজে। শুরু হল আমাদের দুই বন্ধুর কলকাতার জীবন। জামসেদপুরের নদী-নালায় পাহাড়ে বেড়ে ওঠা মফস্বলের দুটি ছেলের চোখ তখন ঝলসে দিচ্ছে কলকাতা। কিন্তু শুধু চোখ নয়, কলকাতা, তুমি পুড়িয়ে দিয়েছ আমাদের হাত পা হৃদয়। তুমি, কলকাতা, তুমিই আমাদের হৃদয় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঝরিয়েছ রক্ত, করে তুলেছ বুকের গভীরে গভীর ক্ষত। ব্যথায় নীল হয়ে উঠে অসহায় যাতনায় আর বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছি কলকাতা তোমার নিষ্ঠুরতা। প্রতি পদে মনে পড়েছে ছানিদার কথা,—'পৃথিবী বড় নিষ্ঠুর জায়গা রে! এখানে বড় হতে হলে দু-জন বাপের দরকার।'

কিন্তু এ সব তো অনেক পরের কথা। কলকাতায় এসে আমাদের প্রথম দিকের দিনগুলি কেটেছিল স্বপ্নের মত। দিনের পর দিন আমরা বেড়ে উঠেছি আর সাফল্যের পর সাফল্য জড়ো করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি পাঁচজনের মাঝে। জামসেদপুরের দুটো মফস্বলী ছেলে তখন তোলপাড় করছিল কলকাতা, পশ্চিম বাংলা আর ভারতবর্ষের নামী দামী বক্সিং রিংগুলিকে।

ফুল যেমন আস্তে আস্তে ফুটে ওঠে, কলেজে উঠে অমলের বক্সিং প্রতিভাও সেইভাবে বিকশিত হয়ে উঠল। কলেজে আমাদের ট্রেনিং-এর ভার নিলেন গণেশদা। গণেশদা ৫২, ৫৩-র হেভিওয়েট

বাংলা চ্যাম্পিয়ান। গণেশদা খুব গরিব, টালার দিকে এক বস্তিতে থাকেন। বিভিন্ন কলেজ আর ক্লাবে বক্সিং শিখিয়ে কোনমতে বেঁচে আছেন। কিন্তু গরিব বলেই বোধহয় এত ভাল উনি। গণেশদার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি সবসময় ঝুলে আছে যে হাসি দিয়ে পৃথিবী জয় করা যায়। আমি বহুবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ওইরকম একটা হাসি প্র্যাকটিস করতে চেয়েছি। তাতে গালের পেশীই ব্যথা করেছে শুধু, হয়নি কিছুই। অমল বলত,—'গণেশদা, আপনার এই হাসি যতদিন আছে, পৃথিবীতে আপনার মার নেই।'

উত্তরে গণেশদা হাসতেন।

একটা কথা আছে, 'বুকে করে আগলানো'। কিন্তু গণেশদা যেন আমাদের বুকে করে শেখাতে লাগলেন বক্সিং-এর উন্নত প্রথা-প্রকরণ। প্রথম দিন আমার আর অমলের মিনিট-পাঁচেক বক্সিং দেখেই উনি আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। বলেছিলেন,—'তোরা তো হীরে রে, হীরে! খনির নতুন হীরে, এখনও কাটা বাকি আছে! পালিশ বাকি আছে। তারপর দেখিস তোদের কী জেল্লা! লোকের চোখ ঝলসে যাবে!'

আমাদের প্র্যাকটিস পর্যবেক্ষণ করতে করতে গণেশদা মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন, বলতেন,—'তোদের কার কাছে বক্সিং-এ হাতে খড়ি?'

অমল বলত,—'ছানিদার কাছে। তিনি আমাদের ধর্মবাপ।'

গণেশদা কপালে হাত ঠেকাতেন,—'ও, তাঁকে আমার প্রণাম। উনি ঠিক জিনিস চিনেছিলেন। তোদের নষ্ট হয়ে যেতে দেননি।'

তা আমি যদি প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা হয়ে থাকি, তবে অমল হল ক্ষণজন্মা প্রতিভা—যে প্রতিভা কখনো-সখনো দেখা যায়, যে প্রতিভা শুধু শিক্ষণশীলই নয় সৃজনশীলও। কত নতুন নতুন মার দেখেছি ওর হাতে কেমন অবলীলায় বেরিয়ে আসতে। কত দুরূহ অ্যাঙ্গল থেকে ওকে দেখেছি পলকে ম্যাচ-জেতা ঘুসিটি চালাতে। অসম্ভব রকম সঙিন অবস্থাতে ওকে দেখেছি প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে

আসতে। বক্সিং-এর রিং-এ অমল যেন ক্ষুধার্ত শার্দুল! ওর চলাফেরা, প্রতিপক্ষের দিকে তাকানোর ভঙ্গী, ওর আক্রমণ, ওর আত্মরক্ষা, প্রতি-আক্রমণ সবই যেন সত্যি-সত্যি কালাহারির কেশররাজের মতই। অমল রাতারাতি প্রসিদ্ধি পেল। অমলকে নিয়ে কাগজে হৈ-চৈ পড়ে গেল। বোম্বের স্পোর্টস উইকলি তো লিখেই বসল—অমল বোস আজ অবধি ভারতীয় বক্সিং-এর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা।

আমার সংগ্রহেও নেহাত কম কৃতিত্ব ছিল না। অমলের ঠিক পেছন-পেছনই ছিলাম আমি। সেকেণ্ড ইয়ারে প্রথম রিং-এ নেমেই আমি আন্তঃ-কলেজ জিতলাম। সেই বছরই ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত আন্তঃ-রাজ্য যুব বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপে রৌপ্যপদক পেলাম আমি। ফাইন্যালে তুপয়েণ্টে হেরে গেলাম সারভিসেসের জিৎবাহাতুরের কাছে। কিন্তু বেস্ট বক্সারের কাপ পেলাম আমিই। ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় অমল অংশ নেয়নি। গতবার দিল্লীতে অমল এই প্রতিযোগিতায় জিতে এসেছিল। অমলের এবার না যাওয়ার কারণ গণেশদার স্ট্রাটেজি। আগামী শীতে ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যুব-এশিয়ান গেমস। এই প্রতিযোগিতায় অমলকে যে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে তা অবধারিত। কানাঘুসোয় শুনেছি এছাড়া যাচ্ছি আমিও। আর যাচ্ছে সারভিসেসের জিতবাহাতুর, রেলওয়ের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বক্সার ক্রুনো গ্রেগ আর অন্ধ্রের এম. ভি রামারাও। গণেশদা ভারতীয় টীমের ম্যানেজার-কাম-কোচ হচ্ছেন একরকম প্রায় নিশ্চিত। তাই গণেশদার কাছে এখন ব্যাঙ্গালোরের প্রতিযোগিতা খুব বড় কিছু একটা না। এশিয়ান গেমস এখন তাঁর ধ্যান জ্ঞান। গণেশদা জীবনে এই প্রথম বড় ধরনের কোন একটা কাজ করতে পাচ্ছেন। গণেশদার তুরুপের তাস অমল। গণেশদা স্থির-নিশ্চিত, অমলকে দিয়ে তিনি এশিয়ান গেমসের রিং-এ ভেল্কি দেখাবেন। তাই গণেশদা চাননি ব্যাঙ্গালোরের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অমল অযথা আচমকা কোন চোট পেয়ে বসুক। তবে, আমাকে পাঠানোর উদ্দেশ্য আমার অভিজ্ঞতা বাড়ানো। তাছাড়া এটাতে ভালো ফল দেখাতে

পারলে এশিয়ান গেমসে আমার দলভুক্তির পক্ষে একটা জোরালো দাবি দাঁড় করাতে পারি আমি। গণেশদা এখন দিনরাত অমলকে নিয়ে পড়েছেন। ক্ষণে ক্ষণে ব্ল্যাকবোর্ডে নতুন স্ট্র্যাটেজি বুঝিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার ডেমনস্ট্রেশন করতে রিং-এ ঢুকছেন। সঙ্গে থাকছি আমিও। অবশ্য এশিয়ান গেমসের জন্য আমাদের আলাদা একটা কোচিং ক্যাম্প হবে। সেখানে বাকি তিনটি ছেলেও আসবে। তখন জোরদার অনুশীলন হবে।

কিন্তু ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরেই পর-পর এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটল যা আমার জীবনকে ধরে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিল। মনে হল আকাশের মত উঁচু একটা কুৎসিত দানব তার কঠিন দু-হাতে সূর্যের গলা টিপে ধরে আমার চারধারের পৃথিবীটাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিল।

॥ ছয় ॥

ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে এসেছি মাসখানেক হল। আগামী এশিয়ান গেমস নিয়ে জোরদার আলোচনা হচ্ছে। এর মধ্যে একদিন অল ইণ্ডিয়া বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ আর. এস. পান্ধীয়ালা বোম্বে থেকে কলকাতায় এলেন। এসে দেখা করে গেলেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের উৎসাহিত করে গেলেন। গণেশদার ট্রেনিং-এর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। যাওয়ার আগে আমাদের নিশ্চিত করে গেলেন, প্রতিনিধি লিস্ট মোটামুটি ঠিকই আছে। আমি আর অমল যাচ্ছিই। আর গণেশদার তো কথাই নেই—গণেশদা ম্যানেজার-কাম-কোচ হয়ে যাচ্ছেন এটা একেবারে ফাইনাল।

সেদিন বিকেলে বসে আছি আমাদের ক্লাব ক্যাম্পাসে। এই-মাত্র আমি, অমল আর গণেশদা প্র্যাকটিস সেরে এলাম। আর পঁচিশ দিন পর শুরু হচ্ছে যুব এশিয়ান গেমস। দিন পাঁচেক পরই ভারতীয় টীম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। আমার আর অমলের পরনে সাদা শর্টস আর হাত-কাটা গেঞ্জি, এখন কাঁধের ওপর

একটা করে তোয়ালে। গণেশদার পরনে কালো ট্র্যাকস্যুট। তিনটে ডেক চেয়ারে শরীর এলিয়ে লেবুর সরবত খেতে খেতে তখন সলিড আড্ডাই মারছিলাম আমরা। এমন সময় ক্লাবের দারোয়ান রামভজন একটি টেলিগ্রাম-পিয়নকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল,—'বাবু, আপনার তার।'

—'আমার তার!'—আমি চমকে উঠলাম। আমরা বাঙালী মধ্যবিত্তরা, তার মানেই কোন কিছু দুঃসংবাদ আশঙ্কা করি। কাঁপা হাত এগিয়ে দিলাম পিয়নটার দিকে,—'কই দেখি!'

—'তার? কী ব্যাপার!'—অমল অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করল পাশ থেকে।

সাইন করে মেসেজ নিলাম। খুলে পড়ে প্রথমটা কিছুই বুঝলাম না। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। দ্বিতীয় বার আবার চোখ বোলালাম। আমার মুখের রেখাগুলি আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে আসতে লাগল। কাগজটা হাতে নিয়ে পাথরের মত বসে রইলাম।

অমল দ্রুত আমার আড়ষ্ট হাত থেকে মেসেজটা নিল। আমি গণেশদার বিস্ফারিত চোখের দিকে চোখ রেখে বললাম,—'বাবার অবস্থা খুব খারাপ। এখুনি যেতে লিখেছে।'

গণেশদা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন,—'এখন কোন গাড়ি আছে?'

—'আছে, পাঁচটা পঁয়ত্রিশে। স্টীল এক্সপ্রেস।'—অমলই উত্তর দিল। ও তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে,—'গণেশদা, তুমি সেক্রেটারির গাড়িটা ব্যবস্থা কর। এক্ষুনি বেরিয়ে না পড়লে ট্রেন ধরতে পারব না।'

—'তুই যাবি নাকি!'—আমি শুকনো গলায় প্রশ্ন করলাম।

—'সেটা আবার তোকে প্রশ্ন করে জানতে হবে!'

—'না।'

—'কেন, অমল যাক না তোমার সঙ্গে। ওখানে যদি কোন দরকার থাকে।'—গণেশদা কথা বললেন এবার।

—'কোন দরকার নেই। তার চেয়ে অনেক বড় দরকার ওর এখানে। ওখানে যদি কিছু হয়েই থাকে তবে লোকের অভাব হবে না, গণেশদা। কিন্তু অমলের এখন একদিনও প্র্যাকটিস বন্ধ করা চলবে না।'

—'আমি কী করব না করব সেটা তোর থেকে জানতে হবে? আমাকে এখন মাসিমার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে।'—অমলের গলায় কেমন অজানা একটা জিদ ঝরল।

আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। আমার মনে পড়ে গেল আমার অসুখের সময় অমলের জিদের কথা। না না, বার-বার আমি অমলের সাফল্যের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াব না। অমলকে বলতে ইচ্ছা করল -- তুই আর আমাকে কত কৃতজ্ঞতা-পাশে বাঁধবি রে অমল? বার-বার আমার বিপদের দিনে আমার পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য তুই নিজের আর কত ক্ষতি করবি, ইডিয়ট! তুই-ই শুধু আমার বন্ধু, আমি তোর নই? তুই জানিস, তুই বার-বার তিনবার স্কুলে চ্যাম্পিয়ান হতে পারিসনি বলে কতখানি কষ্ট আজও আমার বুকে! এর ওপর তুই আবার এশিয়ান গেমস পায়ের তলায় মাড়িয়ে যেতে চাইছিস। ইয়াকি, না?

অমলকে ওর এই একরোখা জিদ থেকে আটকাবার জন্য এখন আমি ওকে যে-কোন রকম আঘাত করতে প্রস্তুত, তাতে আমার বুক যত রক্তাক্তই হোক। আর সেই আঘাতটাই করলাম অমলকে, আমার মুখের কথায়। রূঢ় স্বরে বললাম—'তুই খুব মহৎ, না? লোকের উপকার করে দেখাতে চাস তুই কত বড়! কিন্তু এটা তোর জানা উচিত গায়ে পড়ে উপকার করলে লোকে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়।'

—'বিরক্ত হয়!'—অমল যেন আমাকে নয়, চোখের সামনে আমার ভূত দেখছে এইভাবে আঁতকে উঠল।

—'হ্যাঁ, হয়। আমার ব্যাপার আমাকে দেখতে দে। তোর ব্যাপার তুই দেখ। তোর কাছে এখন এশিয়ান গেমস অনেক বড় ব্যাপার।'

গণেশদা ইতিমধ্যে চলে গেছেন ক্লাবের ভেতরে। মনে আছে, আমার কথা শুনে অমল পাক্কা দু-মিনিট আমার দিকে কেমন যেন থতমত-খাওয়া চোখে চেয়ে ছিল। অমলের শুকনো খটখটে দুটো চোখ চকচক করে উঠেছিল, তারপর বিড়বিড় করে বলল— 'তুই এই কথা বললি! এশিয়ান গেমস অনেক বড় ব্যাপার,—তুই বলতে পারলি!'

আমি উত্তরে কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এর মধ্যে হৈ-হৈ করে গণেশদা গাড়ি নিয়ে হাজির। চিৎকার করে বললেন— 'চলে এস! কুইক্!'

গণেশদার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখি, অমল আমার সামনে নেই। ও ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে ক্লাবঘরের দিকে। ওর চওড়া কাঁধের উপর সাদা তোয়ালেটা মিছিল-শেষের বিমর্ষ পতাকার মত মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অমলের উঁচু মাথাটা ঝুলে পড়েছে ওর বুকের উপর।

॥ সাত ॥

বাড়িতে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন সব শেষ। বাবাকে শেষ দেখাটুকু দেখতে পেলাম না আমি। কাল রাতে বাবার স্ট্রোক হয়েছিল, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর আধঘণ্টা বেঁচে ছিলেন। কাল মাঝরাতেই সব শেষ। আজ সকালে রতন আমাকে টেলিগ্রাম করেছিল।

বাবা আমাদের ভাসিয়ে দিয়ে গেলেন। বাবা ঋণে ঋণে জর্জরিত ছিলেন, অথচ দুশ্চিন্তায় যাতে আমাদের পড়াশুনোর ক্ষতি না হয় তার জন্য আমাদের ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেননি তাঁর অবস্থা। তার উপর বছর-দুই আগে দিদির বিয়ে দিতে গিয়ে তিনি কম্পানির ঘরে জমা তাঁর শেষ কপর্দক অবধি তুলে নিয়েছেন। অবস্থা এমন যে, এর-পর কাল আমরা কী খাব তার সংস্থান নেই।

রাত এগারোটায় বাড়ি পৌঁছেছিলাম আমি। মা নাকি এতক্ষণ

পাথরের মত বসে ছিলেন। তাঁর চোখে একফোঁটা জল দেখেনি কেউ। কিন্তু আমি বাড়ির চৌকাঠে এসে দাঁড়ানো-মাত্র আমাকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেললেন মা,—'আমাদের কী হবে, বাবা?'

আমি মাকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরেছিলাম। মা ঠক-ঠক করে কাঁপছিলেন। বুঝছিলাম, শোক যতটা না তার চেয়ে বেশী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অদ্ভুত একটা ভয় আর আতঙ্ক মাকে গ্রাস করেছে।

আমার ছোট ভাইবোনেরা এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার পাশে। ওদের চোখেও তখন সেই ভয়ঙ্কর আতঙ্ক।

তেরো দিনের দিন কাজ হল। কুড়ি দিনের মাথায় কলকাতায় ফিরলাম আমি। দু-বছর আগে যে আমি কলকাতায় এসেছিলাম পড়াশুনা করবার জন্য আর আজ যে আমি কলকাতায় ফিরছি, সে দুজনে কী বিস্তর তফাৎ! হুহু-ছুটে-চলা ট্রেনের জানালায় হাতে মাথা রেখে সেই কথা ভাবতে গিয়ে ঠোঁটের কোণে একটা শুকনো হাসি এসে পড়ে। মনে হল জীবনটা কখনই আলিবাবার চিচিংফাঁকের চেয়ে বড় কিছু নয়। আসার আগে মাকে সাহস দিয়ে এসেছি, যেভাবে হোক এবার কলকাতায় গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করব আমি। চাকরি আমাকে একটা পেতেই হবে এবার। চুলোয় যাক আমার বক্সিং! চাকরি করে আমাকে বাড়িতে টাকা পাঠাতে হবে। তারপর রাত্রে কলেজে পড়ে বি. এ. পরীক্ষা দেব।

কিন্তু নিষ্ঠুর কলকাতা তখন আমার জন্য অপেক্ষা করছে আমার জীবনের চরমতম আঘাতটি নিয়ে।

ট্রেন থেকে নেমেই সোজা ক্লাবে চলে গেলাম। জানি, ওখানেই পাব আমার সবচেয়ে বড় দুই সান্ত্বনা। অমল আর গণেশদাকে।

বাস থেকে নেমে ক্লান্ত পায়ে ঢুকলাম ক্লাব ক্যাম্পাসে। কিন্তু রিং-এর কাছে আসতেই চমকে উঠলাম—ঝড়ে বিধ্বস্ত একটা পোড়ো বাড়ির মত শূন্য খাঁ-খাঁ করছে ওটা। কী ব্যাপার? ওরা আজ

প্র্যাকটিসে আসেনি ? এমন সময় দেখি গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকছে ক্লাবের দারোয়ান রামভজন। হাতের ইশারায় কাছে ডাকলাম ওকে, —'কী ব্যাপার, ওরা কোথায় ?'

—'কি জানি বাবু। কুছু গণ্ডগোল হইয়ে গেল। এখন বক্সিং বিলকুল বন্ধ। গণেশবাবু, অমলবাবু কোই না আসে।'

—'কী গণ্ডগোল, রামু ?'—আমি আতঙ্কিত গলায় প্রশ্ন করি।

—কি জানি, বাবু, হামি নাহি জানে। সিকেটারিবাবুকে পুঁছ করেন।'

—'বিমানদা আছেন ?'

—'হঁ, আছেন। কিলাব ঘরের ভিতর!'

—'এসব কী শুনছি, বিমানদা ?'

—'তুই এলি ? কবে এলি ? অ্যাঁ, এ কি চেহারা হয়েছে তোর! শেষ দেখা দেখতে পেয়েছিলি ?'

—'না। তুমি বল কী ব্যাপার।'

—'কোন্ ব্যাপার ? ও,—এশিয়ান গেমস ?'—বিমানদা করুণ চোখে হাসলেন—'ক্লাব করছি আজ পঁচিশ বছর, বুঝলি, এরকম কত ঘটনা দেখেছি। তুই দুঃখ করিস না।'

—'কী হয়েছে ?'

—'শুনিসনি কিছু ?'

—'না।'

তারপর বিমানদা যা বললেন তা শুনে আমি মাটির সঙ্গে মিশে গেলাম।

আজ থেকে পনেরো দিন আগে টীম ডিক্লেয়ার হয়েছে। প্রত্যাশামতই অমল ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছে। সারভিসেস, রেলওয়ে আর অন্ধ্রের সেই তিনটি ছেলেও আছে টীমে। কিন্তু আমি নেই। আমার বদলে বোম্বের একটি অখ্যাতনামা ছেলে যাচ্ছে যাকে কোনদিন কোন বড় প্রতিযোগিতার রিং-এ দেখেনি

কেউ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, টীমের ম্যানেজার-কাম-কোচ হিসাবে নাম ঘোষণা করা হল গণেশ গোস্বামীর নয়, বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ আর. এস. পাঙ্কীয়ালার পেটোয়া লোক ভি. জি. কৃষ্ণমূর্তির। অথচ এই ভি. জি. কৃষ্ণমূর্তির তত্ত্বাবধানেই চার বছর আগে যুব এশিয়ান গেমসে ভারতীয় দল যাচ্ছে তাই কেলেঙ্কারি করে এসেছে।

ক্ষেপে গেল রাজ্য বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন। অমল সহ সারভিসেস, রেলওয়ে আর অন্ধ্রের তিনটি ছেলে জানাল গণেশ গোস্বামী ছাড়া আর কারো তত্ত্বাবধানে তারা এশিয়ান গেমসে যাবে না।

ভাবা গেছিল পাঙ্কায়ালা এবার নত হবেন। কিন্তু হঠাৎ সাতদিন আগে বোম্বে থেকে পাঙ্কীয়ালা উড়ে এসে অমলের সঙ্গে দেখা করেন গোপনে। আর তার পরেই অমল পাঙ্কীয়ালার ডাকা গ্র্যাণ্ড হোটেলের সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করল, সে এশিয়ান গেমসে যাচ্ছে এবং ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসাবে সে তার বাকি তিনজন বিক্ষুব্ধ সহযোগীকেও অনুরোধ করছে, তারা যেন ভি. জি কৃষ্ণমূর্তির তত্ত্বাবধানে এশিয়ান গেমসে যোগ দেয়।

তা অমলই যখন যেতে রাজি হয়েছে তখন ভিনদেশী বাকি তিনটি ছেলেও তাদের আপত্তি তুলে নিয়েছে।

বিমানদা নাকি কানাঘুসোয় শুনেছেন, এশিয়ান গেমস শেষ হওয়ার পর অমলকে ইউরোপ ভ্রমণের একটা প্লেনের টিকিট উপহার দেবেন পাঙ্কীয়ালা। তাছাড়া বি. এ. পাশ করার পর অমলের অক্সফোর্ডে পড়ার ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি।

—'জানিস, গণেশদা খুব আঘাত পেয়েছেন।'—বিমানদা কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, সেখান থেকে আস্তে আস্তে চোখ সরিয়ে আনলেন মেঝের উপর। বিমানদাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল : 'গণেশদা বেচারা জীবনে কিস্সু পেলেন না। গণেশদা যখন বক্সিং লড়তেন তখনও বার-বার কর্তৃপক্ষের অবহেলা পেয়েছেন, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোনদিন ভারতীয় দলে চান্স পাননি। জীবনের এই মধ্য বয়সে তবু নিজের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাচ্ছিলেন, কিন্তু সেটুকুও

হল না। হল না অমলের জন্যে, যে অমলকে তিনি সত্যি-সত্যি নিজের ছেলের মত ভালোবাসতেন। গণেশদা ম্যানেজার না হওয়ার জন্যে যতখানি দুঃখ পেয়েছেন তার চেয়ে ঢের বেশী দুঃখ পেয়েছেন অমলের এই ব্যবহারের জন্যে।'

আমি চেয়ারের উপর বসে ছিলাম আড়ষ্ট ভঙ্গীতে। সমস্ত শরীর জুড়ে একটা বিশ্রী ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। না অমল, না, তুই কখনই এটা করিস নি! তুই কখনই পারিস না গণেশদাকে কষ্ট দিতে!

বিমানদা কখন জানি আবার বলতে শুরু করলেন,—'অমল যে তোর সঙ্গেও এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করবে এটাই কি আমরা কেউ ভাবতে পেরেছিলাম? তোদের দু-জনকে তো আমরা কখনো আলাদা লোক ভাবতাম না। দুই শরীরে তোরা একজন। অথচ তোকে অন্যায়ভাবে বাদ দিয়ে যে টীম ব্যাঙ্কক যাচ্ছে অমল তার অধিনায়কত্ব করতে রাজি হল। আশ্চর্য!

ইউরোপ-ট্যুর আর অক্সফোর্ডে পড়ার সুযোগ। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লোভ। লোভ, তুমি সত্যি এত শক্তিশালী যে, যে-কোন মানুষকেই হারিয়ে দিতে পার! এমনকি আমাদের অমলকেও! ছিঃ, অমল, ছিঃ! বিশ্বাস কর্, কষ্ট নয়—আমি এখন লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছি। লজ্জা পাচ্ছি এইজন্যে যে তোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। লোকে আঙুল তুলে বলবে,—'এই ছেলেটার বন্ধু অমল—ভারতীয় টীমের ক্যাপ্টেন, ওর বন্ধু আর কোচের পিঠে ছুরি মেরে ব্যাঙ্কক গেছে।'

অমল, তুই এক লহমায় আমাকে পৃথিবী-সুদ্ধ লোকের কৃপা আর করুণার পাত্র করে তুললি। লোকে এসে এখন আমাকে 'আহা! উহু!' করে সান্ত্বনা দিয়ে যাবে। তুই জানিস, এই সান্ত্বনা জিনিসটা আমার দু-চক্ষের বিষ।

—'অমলকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে বিমানদা? ওর হোটেলে?'

—'না বোধহয়। ওরা তো কালই ব্যাঙ্কক রওনা হচ্ছে। খুব সম্ভব এখন ওরা পাসপোর্ট অফিসে কিংবা এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিসে

আছে। শুনেছি, আজ দুটো নাগাদ অমল ওখানে টিকিট কিনতে আসবে।'

—'কটা বাজে দেখুন তো!'

—'কেন, সময় দিয়ে কী করবি! একটা দশ।'

—'বিমানদা, আমি আসছি এখুনি।'

—'কী ব্যাপার, এইভাবে পাগলের মত কোথায় ছুটলি? তোর বাড়ির খবর কী?'

আমি ক্লাবের গেট ছেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বললাম,—'এখন একদম সময় নেই। পরে তোমাকে সব বলব, বিমানদা!'

একটা চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে যখন ডালহৌসির এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিসের সামনে এসে পৌঁছলাম হাঁপাতে হাঁপাতে, তখন ঘড়িতে দেড়টার বেশী নিশ্চয়ই নয়। আর ঠিক পাঁচ মিনিট পরই ক্রিমসন কালারের নতুন চকচকে একখানা প্রিমিয়ার প্রেসিডেণ্ট অমলকে নিয়ে এসে থামল সামনের ফুটপাত ঘেঁসে।

আমি দেয়ালের একপাশ ঘেঁসে দাঁড়ালাম। অমল ধীর পায়ে একটা একটা করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল উপরে। আর তার ঠিক একঘণ্টা পরেই বেরিয়ে এসেছিল অমল। পেছন থেকে ওর কাঁধে হাত রেখেছিলাম আমি। তারপর···

—'বাবু, আর এক কাপ চা দেব আপনাকে?'

—'উঁ?'—প্রায় একটা তন্দ্রা থেকে যেন চমকে উঠলাম আমি। দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে আছে দোকানের ছোট ছেলেটা।

ছেলেটার লাজুক মুখে মিষ্টি হাসি। ওর হাতে চায়ের পয়সা গুনে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—'তোর নাম কি রে?'

লাজুক চোখে ছেলেটি উত্তর দিল,—'হরিয়া।'

ছেলেটির মুখে একটা অদ্ভুত মায়া মাখানো। ইচ্ছা হল একবার জিজ্ঞাসা করি, হরিয়া তোর মায়ের জন্য কষ্ট হয় না? কিন্তু নিজেকে দমন করলাম। পকেট থেকে একটা সিকি বের করে ওর হাতে দিলাম। কিছুতেই নেবে না। জোর করে ওকে দিয়ে আবার ডালহৌসির জনচঞ্চল পথে নামলাম।

কানে ভাসছে অমলের শেষ কথা-কটা: 'যাঃ যাঃ বেশী বড়াই করিস না! আমার মত সুযোগ পেলে তুইও যেতিস! জানা আছে আমার সবাইকে! আমার ভাল বুঝি তোর আর সহ্য হচ্ছে না? হিংসে হচ্ছে, না!'

॥ আট ॥

দীর্ঘ ছ-মাস কেটে গেছে। কলেজ ছেড়ে দিয়েছি, দিয়েছি মাইনে দিতে পারি না বলে। বক্সিংও ছেড়ে দিয়েছি। ক্লাবে আর যাই না। মাঝে-মাঝে গণেশদা আর বিমলদার সঙ্গে দেখা করি চাকরির উমেদারির জন্যে। ওঁরা অসহায় চোখে হাসেন। সাহস দেবার চেষ্টা করেন আমাকে। বলেন, 'জীবন মানেই সংগ্রাম। লড়তে হবে ভাই। যে ভালো লড়তে পারবে সে-ই বেঁচে যাবে।'

মাসে দু-খানা করে চিঠি আসে মায়ের। প্রথম দিকে তাতে শুধু কান্না মিশে থাকত। এখন থাকে হতাশা, দীর্ঘশ্বাস আর বিভীষিকা। মা শেষ চিঠিতে লিখেছেন, মায়ের শেষ খণ্ড গহনা অবধি বিক্রি হয়ে গেছে। পাওনাদাররা বাড়ির সামনে এসে বিশ্রীভাবে চেঁচামেচি শুরু করেছে। মা লিখেছেন, আমি একটা টিউশানিও কি পাই না!

না, পাই না। কিছু পাই না। কলকাতা শহর দোর বন্ধ করে রেখেছে। ভিখিরি দেখলে লোকে যেভাবে দোর বন্ধ করে দেয় সেইভাবে। কোথাও কোন সুযোগ নেই। এখন একটা গেঞ্জি-কলের অর্ডার সংগ্রহের কাজ করে কোনমতে নিজের পেটটুকু চালাচ্ছি।

পটুয়াটোলা বাই লেনের একটা ঘিঞ্জি-মতন মেসে থাকি। যে

ঘরটায় থাকি সে ঘরটা বোধহয় শেষ সূর্যের মুখ দেখেছিল জব চার্নকের আমলে। ওর হলুদ-হয়ে-যাওয়া দেওয়াল আর প্রায়-খসে-পড়তে-চাওয়া ছাদের বীমগুলি দেখলে এখন আর ভয় পাই না আমি। বরং নিজের জীবনের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পাই। এক-একদিন রাত্রে খেটেখুটে ক্লান্ত হয়ে যখন মেসে ফিরে আসি, এসে গোটাচারেক রুটি কোনমতে ঠাণ্ডা জল আর ট্যাড়স সেদ্ধ দিয়ে গিলে নিজের সীটে এসে শুয়ে পড়ি, তখন এই ঘরটা, এই ঘরটার দেওয়ালগুলি, এর ছাদ, জানালা—সবগুলির প্রতি কেমন একটা সহানুভূতি ছড়িয়ে পড়ে আমার। মনে হয়, এই ইটগুলি দিয়ে তো ডালহৌসি স্কোয়ারের সেই গর্বোদ্ধত প্রাসাদগুলির যে-কোন একটি তৈরি হতে পারত! আর পারলে ওর বিশালত্ব দেখে ভয়ে শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নিচু হয়ে আসত। কিন্তু বেচারার ভাগ্য খারাপ, তাই ডালহৌসি স্কোয়ার নয়, উত্তর কলকাতার পটুয়াটোলা বাই লেনের ঘিঞ্জি-মতন একটা মেস-বাড়ি তৈরির কাজে ওর জীবন চলে গেল। রোদ আর হাওয়ার অভাবে বেচারার জীবনে অকালেই ঘুন আর জরা ধরা পড়েছে। কী হতে পারত, আর কী হল!

অমলের সঙ্গে তারপর আর দেখা হয়নি। দেখা হয়নি, কারণ আমরা কেউই আর কারো সঙ্গে দেখা করতে চাইনা। অমল খুব এশিয়ান গেমসে সোনা জিতে এসেছে। ওকে নিয়ে এখন স্পোর্টস পেপারে ধন্য-ধন্য পড়ে গেছে। আমার কথা ভুলে গেছে সবাই। এক সময় আমি যে বক্সিং লড়তাম এবং প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা হিসাবে আমারও একটা স্বীকৃতি ছিল তা যেন লোকে ভুলেই গেছে। কাগজে কাগজে কভারে কভারে এখন শুধু অমলের হাস্যোজ্জ্বল মুখের ছবি।

কিন্তু ছ-মাস পর একদিন সূর্য উঠল। গণেশদা আর বিমানদা হৈ-হৈ করে মেসে এসে উপস্থিত।

—'তোর একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছি রে!'—গণেশদার চোখদুটো চক-চক করে উঠল।

—'ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে তোর চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে।'—জানান বিমানদা।

—'ব্যাঙ্কে!'—আমার চোখদুটো যেন হৈ-হৈ করে উঠতে চাইল— 'গরিবকে লোভ দেখিও না বিমানদা, পাপ হবে কিন্তু!'

বিমানদা হাসলেন। বললেন,—'না রে, সত্যিই একটা ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যাঙ্কেই আমরা তোর জন্যে চেষ্টা করছিলাম। তুই তো ভাবিস তোর জন্যে কেউ কিছু করে না। ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানকে আমরা ক-দিন ধরে ধরেছিলাম। জানিস তো ওদের ব্যাঙ্কে স্পোর্টসম্যান হিসাবে প্রতিবার কয়েকটি ছেলেকে রিক্রুট করা হয়। তোর কথা শুনে উনি সিমপ্যাথাইজড্। বলেছেন, বেশ ও যদি রাজ্য-বক্সিং-এ চ্যাম্পিয়ান হতে পারে তবে ওকে নির্ঘাত আমরা নেব। তোকে নিয়ে কাল আমরা যাব ওঁর কাছে। উনি দেখতে চেয়েছেন তোকে।'

—'কিন্তু অমল থাকতে রাজ্য-বক্সিং আমি জিতব কী করে? তাছাড়া প্র্যাকটিস নেই, ছ মাস ধরে স্কিপিং বন্ধ। দম নেই এক ফোঁটা। এখন রাজ্য-বক্সিং জিতব আমি! মাথা খারাপ তোমাদের!'

কিন্তু গণেশদার উৎসাহ অফুরান,—'আমরা সব খবর নিয়ে এগিয়েছি, বুঝলি? অমল এবার নামছে না। ওর ফাইনাল পরীক্ষা এবার, তাই ছ-মাসের মধ্যে ও আর কোন প্রতিযোগিতায় নামবে না। জানুয়ারিতে একেবারে অল-ইণ্ডিয়া সিনিয়ার কম্পিটিশনে নামবে। তাছাড়া, তুই অত ভেঙে পড়ছিস কেন? হাতে এখনও আমাদের দু-মাস সময় আছে। তোর হাতে মার আছে। দু-মাস প্র্যাকটিস করলে যথেষ্ট। আমি তো থাকছিই সঙ্গে। তোর সামনে দাঁড়াবার মত এখনও পশ্চিম বাংলায় কেউ নেই একথা হলফ করে বলতে পারি।'

পরদিন দুপুরে গণেশদা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ দত্তর সঙ্গে দেখা করাতে। ওরে বাবা, কী অফিস আর কী চেম্বার মিঃ দত্তর! দেখলেই বুকের ভেতর গুর-গুর করে ওঠে। কিন্তু মিঃ দত্ত কী অমায়িক লোক!

গণেশদা পরিচয় করিয়ে দেবার পর হেসে বললেন,—'ও, তুমিই সেই ওয়েস্ট বেঙ্গলের দুর্ধর্ষ বক্সার! তোমার নাম বহু শুনেছি আমি। কিন্তু সামনা-সামনি দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি অত্যন্ত নিরীহ ছেলে হে!'

গণেশদা পাশ থেকে হেসে বললেন,—'কিন্তু রিং-এ ছেড়ে দিন, এই ছেলেই মুহূর্তে শিকারী বাজের মত চলাফেরায় প্রতিপক্ষকে সন্ত্রস্ত করে দেবে।'

'নাকি!'—মিঃ দত্ত হো-হো করে হেসে উঠলেন—'তারপর কী খাবে বল, তিনটে কোক বলি, কেমন?'

সঙ্গে সঙ্গে বরফের মত ঠাণ্ডা পানীয় চলে এলো হাতে হাতে। মিঃ দত্ত বললেন,—'ভাল প্র্যাকটিস কর যাতে এবার চ্যাম্পিয়ান হতে পারই। চ্যাম্পিয়ান হলে তোমার চাকরি হতে আটকাবে না।'

আমি মাথা নিচু করলাম।

গণেশদা বললেদ,—'আশীর্বাদ করুন স্যার, যেন ও সত্যি-সত্যি জিততে পারে।'

—'নিশ্চয়ই জিতবে! ওকে দেখেই আমার মনে হচ্ছে একদিন খুব বড় লড়িয়ে হবে ও।'

॥ আট ॥

শুরু হল আমার সাধনা। মনে আছে এশিয়ান গেমসের আগে গণেশদা যেভাবে অমলকে নিয়ে পড়েছিলেন, এবার আমাকে নিয়ে পড়লেন সেইভাবে। এতদিন বক্সিং ছিল আমার প্রিয় খেলা। কিন্তু সেই বক্সিংই যে একদিন আমার জীবন-মরণের চাবিকাঠি হয়ে উঠবে, জীবনের এতবড় একটা ঠাট্টা আমি কোনদিনই আশা করতে পারিনি। এ লড়াই জিততে পারলে আমি বেঁচে যাব, আমার মা, ভাই-বোনেরা বেঁচে যাবে। আর যদি হারি····· না, সে কথা ভাবতেই আমার পাঁজরের হাড়ে হাড়ে বরফগলা স্রোত বয়ে যায়।

কিন্তু প্র্যাকটিস যেভাবে এগুচ্ছে তাতে আমি ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছি। গণেশদা যতই আশা দিন আমি বুঝতে পারি সেগুলি

আমাকে সাহস দেবার জন্য গণেশদার স্তোকমন্ত্র। যেখানে কম করেও রোজ আমার আট ঘণ্টা প্র্যাকটিস করার কথা সেখানে দু-ঘণ্টা প্র্যাকটিস করার পরই হাঁপিয়ে উঠি আমি। প্র্যাকটিস করে উঠে এক গ্লাস গরম দুধ আর ডিমের বদলে লাল চা আর শুকনো পাউরুটি দিয়ে আগুন-জ্বলা পেটকে ঠকাই।

আট ঘণ্টা প্র্যাকটিস করার মত সঙ্গতিও নেই আমার। প্র্যাকটিস-পার্টনার হিসাবে ক্লাবের একটি গরিব ছেলেকে ঘণ্টায় আট আনা হিসাবে ভাড়া করে এনেছি। রোজ তাকে এক টাকা করে দিতে হয়। সেই টাকাটাও জোগাড় করতে পারছি না। ভাল প্র্যাকটিস-পার্টনার আনতে হলে তার খরচ অনেক বেশী। আর শুধু প্র্যাকটিস নিয়ে পড়ে থাকলেই আমার চলবে না, সকাল এগারোটার পর ক্লান্ত শরীর নিয়ে আবার অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজে ঘুরে বেড়াতে হয়। এরপর আবার শুনেছি সনৎ মুখার্জি আর টমাস হাওয়ার্থ আসছে এবার প্রতিযোগিতায়। সনৎ মুখার্জির লড়াই আমি দেখেছি গতবার খড়্গপুর রেলওয়ে ইনস্টিট্যুটে। দারুণ লড়ে। অসাধারণ দম। টমাস সম্বন্ধে খবর পেলাম ছেলেটি সত্যি প্রতিভাবান। ওর বাঁ হাতে নাকি বজ্র লুকানো আছে। একবার মওকা-মত ঝেড়ে দিতে পারলে নির্ঘাত নক আউট। অর্থাৎ এদের দু-জনের মধ্যে কাউকে যদি আমার ফার্স্ট রাউণ্ডে মোকাবেলা করতে হয় তবেই গেছি। কোয়ার্টার ফাইনাল অবধিও আর পৌঁছতে হচ্ছে না। ক্রমেই চারিদিকে অন্ধকার দেখছি।

আর ঠিক পনেরো দিন পর বিমানদা এসে যে খবরটা দিলেন তাতে আমি একেবারে ভেঙে পড়লাম। নাঃ, আর কোন আশা নেই!

বিমানদা বললেন,—অমল তোর এত বড় শত্রুতা করবে আমরা ভাবতে পারিনি। অথচ ও-ই ছিল তোর সবচেয়ে বড় বন্ধু।'

আমি আর গণেশদা তখন প্র্যাকটিস সেরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। অবাক গলায় প্রশ্ন করলাম,—'অমল আবার কী করল?'

—'অমল ট্যুর্নামেণ্টে নামছে। কাল ওর নাম দিয়ে এসেছে বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে। আর ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের মিঃ দত্তের সঙ্গে দেখা করে বলেছে এই চাকরিটা ওর চাই। জিতলে চাকরিটা যেন ওকেই দেওয়া হয়। অমল ওর বন্ধুদের বলে বেড়াচ্ছে ও এবার ট্যুর্নামেণ্টে নামত না, স্রেফ তুই নামছিস ব'লেই নাকি ও নামছে। তোকে ও একবার রিং-এর মধ্যে দেখে নিতে চায়।'

ক্লান্ত গলায় প্রশ্ন করলাম,—'কেন, আমি ওর কী করেছি, বিমানদা? ও আমাকে দেখে নেবে কেন!'

—'বোঝ্ তুই!'

পাশ থেকে অস্ফুট গলায় গণেশদা ঘৃণা ছড়ালেন,—'সোয়াইন!'

আমি করুণ চোখে হেসে বললাম,—'তবে আর কেন গণেশদা, এবার পাততাড়ি গোটাও।'

—'মেয়েদের মত কথা বলিস না! না লড়ে হাল ছাড়বি কেন তুই? আমিও দেখে নিতে চাই অমল বোস কতবড় বক্সার হয়েছে!'

—'এটা তোমার রাগের কথা হল, গণেশদা। তুমি নিজেও জান অমল আমার চেয়ে কত বড় বক্সার।'

তবু গণেশদার জিদেই আমার প্র্যাকটিস চলল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ছেড়েই দিতাম, কিন্তু গণেশদার মুখ চেয়ে ছাড়তে পারিনি। যদিও লড়াইয়ের আগেই আমি জানি লড়াইয়ে ফল কী হবে!

খবর পাচ্ছি অমল আবার দারুণ প্র্যাকটিস শুরু করেছে। বোম্বে থেকে মিঃ পাল্কীয়ালা মিঃ দাঁভেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। দাঁভে ভারতের প্রাক্তন হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান। ছ-মাস হল লণ্ডন থেকে বক্সিং কোচিং-এ ডিপ্লোমা নিয়ে ফিরে এসেছেন। এই দাঁভের তত্ত্বাবধানে আধুনিক কৌশলে চলছে অমলের প্র্যাকটিস। রোজ শুধু পার্টনারের সঙ্গেই প্র্যাকটিস করছে ছয় ঘণ্টা। প্রথম শ্রেণীর পার্টনার। বহু টাকা ভাড়া তার। তাছাড়া আর দু-ঘণ্টা শারীরিক কসরত। মোট আট ঘণ্টা—যে ন্যূনতম প্র্যাকটিসটুকু যে-কোন বড় ট্যুর্নামেণ্ট জেতার

পক্ষে অপরিহার্য। সে জায়গায় আমার প্র্যাকটিস বেড়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র তিন ঘণ্টায়। ভাবলেও হাসি পায়।

কিন্তু লড়াই শুরু হবার আগেই অমল যেভাবে আমার বিরুদ্ধে বাক্‌যুদ্ধ শুরু করল তাতে আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে রাতের অন্ধকারে শহর ছেড়েই পালাব কি না ভাবতে শুরু করলাম।

অমল বলে বেড়াচ্ছে, ও নাকি আমার দাঁত দিয়ে ওর জামার বোতাম বানাবে।

কখনও বলছে, আমাকে নতুন তুলোর মত ধুনে আকাশে উড়িয়ে দেবে।

আমাকে নাকি তু-রাউণ্ডের বেশী ও রিং-এই থাকতে দেবে না। তার আগেই নক আউট হয়ে যাব আমি।

আমার জীবনে নাকি এটাই শেষ লড়াই হতে যাচ্ছে।

আমাকে একটা ফোটো তুলে রাখতে বলছে অমল। কেননা, অমলের মুখোমুখি হবার পর আমার চেহারা আর আগের মত থাকবে না—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি কখনো-কখনো উত্তেজিত হয়ে পড়ি। কিন্তু গণেশদা আমাকে ঠাণ্ডা করেন—'ওসব কথায় কান দিস না। এও এক ধরনের স্ট্র্যাটেজি, বুঝলি? লড়াইয়ের আগে স্রেফ ভড়কি দিয়ে প্রতিপক্ষের নার্ভ উইক করে দেওয়া। এসব বাজে লড়ুয়ের লক্ষণ। অমল আজকাল এসব পথ ধরেছে! ছিঃ, অমলের এতটা অধঃপতন আশা করিনি!'

যেদিন ট্যুর্নামেন্টের দিন ঘোষিত হবে সেদিন সকাল থেকেই আমি জ্বরে পড়লাম। প্রায় একশ চার জ্বর। গণেশদা রিক্সা করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তারবাবু দেখে অভয় দিলেন,—'ভয়ের কিছু নেই। নার্ভ ফিভার। এই ট্যাবলেটগুলো খাও, আজই সেরে যাবে।'

আমিও বুঝতে পারছিলাম, ভয়ে আতঙ্কে আর দুশ্চিন্তায় জ্বর এসেছে। জীবনে এর চেয়ে বড় ট্যুর্নামেন্টে যোগ দিয়েছি আমি।

কখনও ভয় পাইনি। কিন্তু এবারের টুর্নামেণ্টে আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে। এবারের টুর্নামেণ্টে হেরে যাওয়া মানে শুধু টুর্নামেণ্টেই হেরে যাওয়া নয়, জীবনের কাছে সব-সমেত হেরে যাওয়া।

দুপুরবেলা খেলার ফিক্স্চার হাতে গণেশদা হাসতে হাসতে মেসে ঢুকলেন। সেটা দেখেই আমার জ্বর অর্ধেক সেরে গেল। দুটো গ্রুপ করা হয়েছে। আমি 'এ' গ্রুপে, অমল 'বি' গ্রুপে। কী রহস্যময় কারণে জানিনা টুর্নামেণ্টের বাঘা-বাঘা প্রতিযোগীরা সব অমলের দিকে পড়েছে। সনৎ মুখার্জি, টমাস হাওয়ার্থ, এম.কে. নাইডুর মত দুর্ধর্ষ বক্সাররা সব 'বি' গ্রুপে। আমার গ্রুপে নাম-করা ছেলে নেই। তালিকা দেখে মনে হল, যদি পায়ের উপর একটু শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারি তবে ফাইনালে উঠে যেতে খুব একটা কষ্ট হবে না।

॥ দশ ॥

অথচ সেই পায়ের উপরই শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারলাম না আমি।

২০শে আগস্ট, ১৯২০। শুরু হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বক্সিং প্রতিযোগিতা। প্রথম দিনই আমাকে লড়তে হয়েছিল ওই সুজিতের সঙ্গে।

ছেলেটি নতুন, খুব একটা বড় লড়াইতে এখনও নামেনি। তুলনায় অভিজ্ঞতা খুবই কম ভেবেছিলাম বেশী ঝুঁকি না নিয়ে, গা বাঁচিয়ে স্রেফ পয়েণ্টে জিতে আসব লড়াইটা। গণেশদারও মোটামুটি হিসাব ছিল তাই।

কিন্তু রিং-এ উঠেই সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। জীবনে যা কোনদিন হয়নি, ছানিদার প্রিয় শিষ্যের যে কথা ভাবতেও লজ্জা, সেই ভয় আমাকে পেয়ে বসল। কোথা থেকে কি হল কে জানে, রিং-এ নামা-মাত্র আমার হাঁটুর নিচ থেকে কেমন ঝিম-ঝিম করে উঠতে লাগল। বুঝলাম নার্ভাস হয়ে পড়ছি আমি। আসলে, অমল, তুই আমাকে নষ্ট করে দিয়ে গেছিস। সে লড়াই তোর জন্য শেখা, তোর হাত ধরে শেখা সে-লড়াই আর কোনদিনই লড়তে পারব না বোধহয় আমি।

সুজিত ব্যানার্জি নতুন হলে কি হবে, অত্যন্ত নিষ্ঠা আর অনুশীলনের ছাপ ওর খেলায়। ওজনে আমার প্রায় দ্বিগুণ হবে ও। দশাসই চেহারা, অথচ অত্যন্ত ক্ষিপ্র। ওই চেহারা নিয়ে প্রথমেই অ্যাটাক করল আমায়। আর তখনই সেই ভয়টা পেয়ে বসল আমাকে। সরতে গিয়ে কেলেঙ্কারি করে ফেললাম। ডান পায়ের উপর মুচকে পড়ে গেলাম। পড়ে যাওয়ার মুখে ছেলেটি পাঁজরে আঘাত হানল।

প্রথম রাউণ্ডের শেষে গণেশদা খুব অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে—'কী হয়েছে রে তোর? এত শেকি খেলছিস কেন?'

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। গণেশদাকে বলতে পারছি না, ভয় পেয়ে গেছি। গণেশদা পাঁজরের কাছে আমার আঘাত পরীক্ষা করলেন।

দ্বিতীয় রাউণ্ডে ওঠার আগে গণেশদা কানে কানে উপদেশ দিলেন, —'ছেলেটার ডিফেণ্ডিং জোন ভেঙে তোর রিং-এ নিয়ে আয়। দেখবি, ওকে তুলে নিতে তোর কোন কষ্ট হবে না।'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

কিন্তু রিং-এ উঠে সব উপদেশ ভুলে গেলাম। রেফারির ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র সুজিত বাঘের মত এসে আমাকে আক্রমণ করল। আমি নেতিয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগে পর পর আটটা আঘাত এসে পড়ল আমার কপাল আর কানের পাশে। মনে হল মাথার ভেতর এক ঝলক রক্ত উঠে এসে ঝাঁকি দিয়ে সবকিছু পরিষ্কার করে দিয়ে গেল! রেফারি গোনা শেষ করার আগেই উঠে পড়লাম। রেফারি সেকেণ্ড রাউণ্ড শেষ করলেন।

রিং থেকে নামতেই গণেশদা কাছে এলেন, মুখ গম্ভীর। ওনার মুখ দেখে আমার কষ্ট হল। আমি অল্প হাসার চেষ্টা করলাম—'গণেশদা, এই রাউণ্ডে ওকে তুলে নিচ্ছি, চিন্তা নেই। প্রথম দু-রাউণ্ডে খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম।'

—'ভয়!'

গণেশদা যেন জীবনের সবচেয়ে বড় অবাক-করা ঘটনার কথাটা

এইমাত্র শুনলেন, এইভাবে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। এমনকি আমি যখন তৃতীয় রাউণ্ডে রিং-এ উঠছি তখনও তাঁর সেই বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। আমাকে তৃতীয় রাউণ্ডের প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে ভুলে গেলেন। শেষ মুহূর্তে অবশ্য একবার হুড়োহুড়ি করে কাছে আসতে চাইলেন, আমি রিং-এ উঠতে উঠতে হাত তুলে তাঁকে নিবৃত্ত করলাম।

তৃতীয় রাউণ্ডের ঠিক পাঁচ সেকেণ্ডের মাথায় আমি সুজিত ব্যানার্জিকে নক আউট করলাম। তার জন্য আমার দরকার হয়েছিল ঠিক চারটে ঘুসি। তার মধ্যে ডান হাতের প্রথম তিনটে ঘুসি আসলে কোন ঘুসিই নয়, কিছুটা চাতুরি মেশানো কৌশল, যাতে ওর ডিফেন্স ভেঙে গেল। চতুর্থ বা শেষ ঘুসি তুললাম বাঁ হাতে আর তুলবার পরেই বুঝলাম, প্রথম লড়াই আমি জিতলাম। আমার বাঁ হাতের ফুল লেংথ ঘুসি ওর চোয়ালের নিচে গিয়ে আছড়ে পড়ল।

সুজিত পড়ে গেল।

রেফারি দশ গোনার পরও আর ও উঠতে পারল না।

জিতে নেমে আসতেও গণেশদার মুখে হাসি দেখা গেল না, বললেন,—'খুব বাজে লড়েছিস।'

আমি আলতো হেসে বললাম,—'চলুন ছেলেটিকে দেখে আসি।'

সুজিতকে তখন গ্রীনরুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জ্ঞান ফিরে এসেছে, পাশে একজন ডাক্তার; তিনি চোয়ালের আঘাত পরীক্ষা করে দেখছেন।

আমাকে আর গণেশদাকে ঘরে ঢুকতে দেখে ছেলেটি ম্লান মুখে হাসল, আমি কাছে গিয়ে ওর পিঠে হাত রাখলাম—'তুমি খুব ভাল লড়েছ। এখন কেমন আছ?'

—'ভাল। আপনার কাছে হারব জানতাম। তাই কোন দুঃখ নেই।'

—'তুমি আজ জিততে পারতে যদি একটু ধৈর্য ধরতে। সেকেণ্ড রাউণ্ডে আমাকে অ্যাটাক করে তুমি তোমার সব দম খরচ করে

ফেলেছিলে। কোন সিনিয়ার প্লেয়ারের সঙ্গে লড়ার সময় এই ভুলটা আর কোর না।'

ছেলেটি অপ্রতিভভাবে হাসল। নিজের ভুল স্বীকার করল। আমি আর গণেশদা আর কিছুক্ষণ ওখানে বসে ওকে উৎসাহ দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

দ্বিতীয় রাউণ্ডে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল। আমার বক্সিং জীবনের ইতিহাসে কোনদিন এমন ঘটনা স্বপ্নেও ভাবিনি।

দ্বিতীয় রাউণ্ডে আমার লড়াই পড়ল পঞ্চা রায় নামে একটা বাজে বকাটে গুণ্ডা ছেলের সঙ্গে। রিং-এ ওঠার আগে তার এক সাগরেদ গ্রীনরুমে এসে প্রকাশ্যে আমাকে শাসিয়ে গেল—'এই যে দাদা, আজকের লড়াইটা আপনাকে হারতে হবে, বুঝলেন? পঞ্চাকে জিতিয়ে দিতে হবে। না হলে সিনবোন খুলে লিব!'—শাসানোটাকে জোরদার করার জন্য ছেলেটি কথার শেষে একরাশ ধোঁয়া ছড়াল মুখ থেকে।

গণেশদা তখন আমার চেয়ারের পাশে বসে, কত কম রাউণ্ডে আজকের লড়াইটা শেষ করা যায় সেই আলোচনা করছিলেন আমার সঙ্গে। কথা শুনে আমরা আকাশ থেকে পড়লাম।

আমার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ল কথাটা,—'কেন?'

'—কোন কোশ্চেন করবেন না. মাইরি! যা বললুম তা করবেন। তা-না হলে……।'

হঠাৎ কি হল, পাশ থেকে গণেশদা উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেটির দিকে তেড়ে গেলেন—'তবে রে! গুণ্ডামি করার আর জায়গা পাওনি!' বলে গণেশদা ওর ঘাড় ধরে হিড়-হিড় করে বাইরে টেনে ফেলে দিলেন। ছেলেটি যাওয়ার সময় বলে গেল—'আচ্ছা দেখে লিব!'

আর শেষ অবধি সত্যি ওরা আমাকে দেখে নিল।

ভগবানে যারা বিশ্বাস করে তাদের মস্ত একটা সুবিধে এই যে, যে-কোন দুর্ভাগ্যকেই তাঁর দান বলে মেনে নিয়ে সান্ত্বনা পাওয়া। অথচ, ভগবান বস্তুটা যাদের কাছে ঠিক অত সুলভ নয়, সমস্ত দুর্ভাগ্যের বোঝা একা তাদেরই নীরবে সহ্য করতে হয়।

প্রথম রাউণ্ডে চার কি পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই পঙ্কা রায়কে নক আউট করে দিলাম আমি।

সেদিন ক্লাব হয়ে রাত প্রায় দশটা নাগাদ যখন মেসে ফিরব বলে উঠছি তখন গণেশদা বললেন,—'আমি যাব তোর সঙ্গে?'

আমি একটু অবাক—'কেন?'

—'ওই যে ছেলেটা ভয় দেখিয়ে গেল!'

ব্যাপারটা আমি সত্যি ভুলে গেছিলাম। এবার মনে পড়তে হেসে উড়িয়ে দিলাম—'দূর দূর। ওরা সব ভীতু কাপুরুষের দল—ওদের কী ক্ষমতা!'

বলে আমি হন-হন করে ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু যারা কাপুরুষ আজকাল তাদের শক্তিই সবচেয়ে সুসংহত, সে কথা গণেশদা যেমন জানতেন না তেমন আজ রাত দশটার আগে জানতাম না আমিও।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে বোধহয় সিকি মাইলও আসিনি, হঠাৎ পাশের একটা অন্ধকার কেয়া-ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চারজন। একজনের হাতে হকি-স্টিক আর দু-জনের হাতে ছুরি। একজন মনে হল খালিহাতই। চারজন ঘিরে ধরল আমাকে। না, ভয় পেলাম না। ভয় আমি পাই না। শুধু নিজের দুর্ভাগ্যের কথা মনে করে ঠোঁটে একটা বিষণ্ণ হাসি উঠে আসতে চাইল। আজ যদি এরা আমাকে সে-রকম কিছু আঘাত করে যায় তবে পরশুর লড়াইতে আমি নামতে পারছি না। আর লড়াইতে না নামতে পারা মানে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ—তার মানে চাকরিটাও আর হচ্ছে না আমার।

চারজন ঘিরে দাঁড়িয়ে আমায় আক্রমণ করল। প্রথম আক্রমণটা প্রতিহত করতে গিয়ে চকিতে মনে পড়ল, জামশেদপুরে টিন প্লেটে গুলিজিত খেলার কথা। উঃ, অমলটা যদি আজ থাকত সঙ্গে, তবে এদের সবাইকে আজ এখানে পুঁতে রেখে যেতে পারতাম!

ছুরিছুটোকে আমার ভয় নেই। কেননা আজ আমাকে হাজার চেষ্টাতেও ছুঁতে পারবে না। ভয় শুধু ওই হকি-স্টিকটাকে। তাই

প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করার সময়ই পিছনে চলে এলাম হকি-স্টিক-ধরা ছেলেটির বাঁ পাশে, এসেই ঘুসি চালালাম ওর রগ লক্ষ্য করে। ছেলেটি পেশাদার গুণ্ডা। পড়ে যাওয়ার আগে স্টিক চালাল আমার মাথা লক্ষ্য করে। নিজের মাথাটুকু বাঁচাতে পারলাম বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বাঁচলাম না। ঘাড়ে এসে পড়ল স্টিকের মোক্ষম আঘাত। ওর হাত থেকে স্টিক নিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন মাথাটা মুহূর্তের জন্য ঘুরে গেল। সেই সুযোগে একজন ছুরি চালাল পেট লক্ষ্য করে। যখন খেয়াল হল তখন আর কোন উপায় নেই। তবু বাঁ হাতটা কখন আপনা থেকেই উঠে এসে আড়াল করল। ছুরি এসে পড়ল বাঁ হাতের কনুইয়ের উপর। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। রক্ত দেখে মাথাটা কেমন করে উঠল। বিপদের সময় আমি কিছুতেই অমলের মত মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারি না। আগামী লড়াইটা আমি আর লড়তে পারব না, এই চিন্তাই আমাকে কেমন পাগল করে দিল। একটা প্রচণ্ড ক্রোধ আমার শরীরের সমস্ত আড়ষ্টতা কাটিয়ে দিতে চাইল। এরপর দু-মিনিট স্টিক হাতে নিয়ে আমি রুখে দাঁড়ালাম। তবে এবার চিনে যাও, কাকে ঘাঁটাতে এসেছ তোমরা! দু-মিনিট পর অন্ধকার কেয়াঝোপ লক্ষ্য করে দু-জনকে পালাতে দেখলাম। বাকি দু-জন তখন আমার পায়ের কাছে গোঙাচ্ছে।

হঠাৎ নিজেকে কেমন শূন্য মনে হল আমার। কেমন মনে হল, আমিই এই পৃথিবীর শেষ লোক. আর সবাই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, বাকি আছি শুধু আমিই। আমার যাওয়া হয়নি। আমার দেরি হয়ে গেছে। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। শেষ ট্রেন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। অন্ধকার ময়দান ভেদ করে হু-হু করে বাতাস ছুটছে। বাতাসে সদ্য-ফোটা কেয়ার ভেজা গন্ধ। আদিগন্ত ছড়ানো মাঠে এই অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে—এই হু-হু বাতাস, ওই ভেজা কেয়ার গন্ধ, এই পায়ের-কাছে-পড়ে থাকা দু-জন পর্যুদস্ত অসৎ মানুষ, এই আমার রক্তের-বান-ডাকা হাত, এই জীবন—সবকিছু আমার কাছে কেমন মায়াবী মনে হল।

আমি আমার হাত চেপে ধরে আবার ক্লাবের দিকে দৌড়লাম। বিমানদা আর গণেশদা তখন সবে ক্লাব-ঘরের তালা বন্ধ করে বেরোচ্ছেন। এই সময় আমি ঝড়ের মত এসে উপস্থিত হলাম। আমার ডান হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে তখন রক্ত পড়ছে টপ-টপ করে।

আমাকে এই অবস্থায় দেখে বিমানদা আর গণেশদা দু-জনেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন।

আমি ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললাম—'আমার কী হবে, গণেশদা!'—আমি আমার রক্তাক্ত বাঁ হাত তুলে ধরলাম গণেশদার সামনে।

•

সেই রাত্রেই গণেশদা আর বিমানদা আমাকে ট্যাক্সি করে নিয়ে গেলেন একজন সার্জনের কাছে। উনি দেখে বললেন, ভয়ের কিছু নেই, কোন শিরা ছিঁড়ে যায়নি। শুধু মাংস কেটে গেছে আধ-ইঞ্চি গভীর হয়ে। বললেন, দু-দিনেই সেরে যাবে। চারটে সেলাই পড়ল হাতে। একটা কড়া ডোজের পেনিসিলিন ইনজেকশন দিয়ে দিলেন, আর দুটো পরে নিতে বললেন।

এই প্রথম আমাকে ভাগ্য সাহায্য করল। দু-দিন পরে থার্ড রাউণ্ডের লড়াই ছিল, সেটাতে বাই পেলাম। গণেশদার ফুর্তি দেখে কে! আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এখনও হাতের ঘা কাঁচা আছে। খেলতে হলে বাঁ হাত বাঁচিয়ে খেলতে হবে। এর-পর ফোর্থ রাউণ্ড, সাতদিন পর। কাজেই অনেকদিন বিশ্রাম পাওয়া গেল।

চতুর্থ রাউণ্ডে মুখোমুখি হলাম খড়্গপুরের ইউনিস খাঁর সঙ্গে। পয়েন্টে জিতলাম। বেশ বেগ দিয়েছিল আমায় ইউনিস। স্রেফ পায়ের কৌশলে জিতে গেলাম লড়াইটা। ফাইনালে যেতে পঞ্চম বা শেষ লড়াই হল সেন্ট পল্‌স কলেজের অরিন্দম সরকারের সঙ্গে। ছেলেটি অসম্ভব ধূর্ত আর ক্ষিপ্র। মুহূর্তে নতুন ডিফেণ্ডিং জোন তৈরি

করে নেয়। দু-হাত সমান চলে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে একটি বিপদজনক প্লেয়ার। অথচ এর বিরুদ্ধেই আমি প্রথম রাউণ্ডে চরম বোকামি করে ফেললাম। যার খেসারত স্বরূপ লড়াইটা প্রায় আমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল। লড়াই শুরু হতেই আমি ওর ডিফেণ্ডিং জোন ভেঙে দিতে এগিয়ে গেলাম। আমি তখন উৎসাহ উত্তেজনায় ফুটছি। একে মারতে পারলেই ফাইনালে উঠে যাব। তর সইছে না। তাই ওরকম একটা গোঁয়ারের মত কাজ করে ফেললাম। অথচ রিং-এ ওঠার আগে পর্যন্ত গণেশদা পই-পই করে মানা করে দিয়েছেন, কোনরকম ঝুঁকি যেন আমি না নিই। এরপরই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড, বড় লড়াই। কাজেই এই লড়াইতে কোনরকম আহত হওয়া চলবে না আমার।

অথচ সেই আহতই হলাম আমি এই শেষ লড়াইটাতে। আর বেশ মারাত্মকভাবেই।

আমি এগিয়ে যেতেই ধূর্ত অরিন্দম যেন ভয় পেয়েছে এইভাবে বাঁ পায়ের উপর ত্রস্তে পিছিয়ে গেল। আমি তখনও ডান পা বাড়ালাম, আর বাড়িয়েই বুঝলাম ছেলেটি কী অসম্ভব রকম ধূর্ত। আমাকে লোভের ফাঁদে ফেলে দিল ও। পালটে নিজের ডান পায়ের উপর সরে গিয়ে আমার সম্পূর্ণ বাঁ দিক টালমাটাল করে দিল। আমার আর তখন করবার কিছু নেই। অরিন্দমের তীব্র ভারী ঘুসি সর্বনাশের মত আমার বাম বাহুর উপরে এসে পড়ল।

তারপর সারা খেলায় আমি আর বাঁ হাত তুলতে পারলাম না।

আর এই ঘুসিটা মারতে পেরেই অরিন্দম বুঝল ও জিতে গেছে। কেননা, বাঁ হাতেই আমার ম্যাচ-উইনার ঘুসি। সেটাই ও প্রথম সেকেণ্ডে অকেজো করে দিল।

তৃতীয় রাউণ্ডের শেষেও যখন বাঁ হাত তুলতে পারলাম না, তখন গণেশদা আড়ষ্ট গলায় বললেন,—'ম্যাচ বন্ধ করে দেব?'

আমি কোনমতে মাথা নাড়লাম।

—'পড়ে পড়ে মার খাচ্ছিস, এ যে আর দেখতে পারছি না!

আসলে আমারই ভাগ্যটা খারাপ, বুঝলি ? তা না হলে, তোর মত বক্সার প্রথম রাউণ্ডেই অমন মারাত্মক ভুল করে বসে !'

গণেশদার ঘরঘরে গলায় চাপা বাষ্পের ছোঁয়া।

চতুর্থ রাউণ্ডে রিং-এ ওঠার আগে গণেশদাকে বললাম,—'আমি এই লড়াই জিতবই !'

গণেশদা কেমন ঘোলাটে চোখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। সে চোখে খুব একটা প্রত্যয়ের ছাপ দেখলাম না আমি।

চতুর্থ আর পঞ্চম রাউণ্ডেও ঝড়ের মত মার খেলাম আমি। সবাই ধরে নিল ষষ্ঠ রাউণ্ডে আমি হেরে যাচ্ছি।

ষষ্ঠ রাউণ্ডে ওঠার আগে গণেশদা ভারী গলায় বললেন,—'ফুট ওয়ার্কের উপর খেলে যা, দেখ যদি কিছু করতে পারিস।'

আমার মার-খাওয়া শরীর ষষ্ঠ রাউণ্ডে আমার টালমাটাল পায়ের উপর আবার জেগে উঠল। জেগে উঠল আমার এতদিনের পরিশ্রমের অধীত বিদ্যাগুলি।

ষষ্ঠ, সপ্তম আর অষ্টম রাউণ্ডে দর্শকরা বক্সিং খেলার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখল। বক্সিং যে আর পাঁচটা খেলার মত শুধু খেলাই নয়, এটা মানুষের সেই চরিত্রকে বিকাশ করে যা মার-খাওয়া মানুষের উঠে দাঁড়াবার সংগ্রামের মধ্যে প্রকাশ পায়, সেদিনকার সেই অসামান্য শেষ তিন রাউণ্ড লড়াই যারা দেখেছিল তারা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিল ; বক্সিং লড়তে এসেই আমি এত হৈ-চৈ ফেলেছিলাম কেন, সমালোচক মহল আমাকে একবাক্যে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিল কেন !

অষ্টম রাউণ্ডে টেকনিক্যাল নক আউটে জিতে আমি ফাইনালে উঠে গেলাম।

এই অসম্ভব লড়াইটা জিতে যাওয়াতে গণেশদা যেন উৎসাহে ফেটে পড়লেন। আমি এক-একটা লড়াইতে জিতি আর গণেশদার উৎসাহ এক-এক ধাপ বেড়ে যায়। ফাইনালে উঠে যেতে গণেশদা এমন করতে লাগলেন, যেন চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি।

॥ এগারো ॥

ওদিকে অমলকে তখন প্রতিটি ধাপ কেটে কেটে উঠে আসতে হচ্ছে ফাইনালে। প্রত্যেকটা লড়াই ওকে লড়ে জিততে হচ্ছে। কোয়ার্টার ফাইনালে ও টমাস হাওয়ার্থকে হারাল টেকনিক্যাল নক-আউটে। এই লড়াইতে অমল বেশ আহত হল। খেলা যারা দেখেছে তারা এসে বলল, অমল স্রেফ বুদ্ধির জোরে জিতেছে। সমস্ত লড়াইটা অমল টমাসের বাঁ হাত সীল করে রেখেছিল। টমাস একবারও ওর বাঁ হাত ব্যবহার করতে পারেনি।

সেমিফাইনালে অমল লড়ল খড়্গপুরের সনৎ মুখার্জির সঙ্গে। অমলের লড়াইয়ের টেকনিক চেনার জন্য গণেশদা আমাকে এই লড়াইটা দেখতে নিয়ে গেলেন। এখন মনে হচ্ছে, না গেলেই ভাল হত। সনৎ ছেলেটির যা ফর্ম দেখলাম আর যেভাবে ও রিং-এর ভেতর ঝড় তুলল তাতে সনৎ যদি আমার গ্রুপে পড়ত তবে আমার ফাইনালে ওঠা হয়েছিল আর কি! ওরও দুটো হাত সমান চলে। ছেলেটির যেমন অ্যাটাক, যেমন ডিফেন্স, তেমনি পজিশন জ্ঞান।

আর অমল···? হ্যাঁ এশিয়ান গেমসের গোল্ড উইনারই বটে ও! মধ্যযুগের গ্ল্যাডিয়েটরের মত ঝড়ের মুখে ও উড়িয়ে দিল সনৎকে। অমলের এক-একটা থাবা জয়ের দিকে এক-একটা পদক্ষেপ। এই অমলের সঙ্গে আমাকে ফাইনালে লড়তে হবে! মনটা বিশ্রীভাবে দমে গেল। এর চেয়ে ভাল হত যদি অমলের লড়াই না দেখতাম। তবে অনেক বেশী সাহস নিয়ে ফাইনালে ওর মুখোমুখি হতে পারতাম।

লড়াই শেষ হয়ে যাওয়ার পরও গ্যালারিতে বসে ছিলাম স্থাণুর মত। গণেশদা হাত ধরে তুললেন। আমি বললাম,—'গণেশদা, তুমি আশা কর এই অমলকে আমি হারাব!'

এই প্রথম দেখলাম গণেশদা চুপ করে গেলেন। সাহস দিলেন না আমাকে। মাথাটা কেমন সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে উটের মত হাঁটছিলেন গণেশদা, সেইভাবে স্টেডিয়ামের গেট পেরিয়ে যাবার সময়

বিড়-বিড় করে বললেন,—'জানিস, বক্সিং-এর যে মারগুলির আমি এতদিন স্বপ্ন দেখতাম আজ অমলকে দেখলাম রিং-এর মধ্যে সেই মারগুলির বন্যা বইয়ে দিতে।'

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২০, বেলা তিনটেয় শুরু হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বক্সিং-এর চ্যাম্পিয়ানশিপ নির্ণায়ক লড়াই।

গ্রীনরুমে বসে আছি আমি, গণেশদা, বিমানদা এবং আরো কয়েকটি জুনিয়ার ছেলে। বেলা আড়াইটে এখন। আর ঠিক আধঘণ্টা পর রিং-এ উঠব। এইমাত্র গণেশদা আমার ম্যাসাজ শেষ করলেন। আমি এখন যে চেয়ারে বসে আছি ঠিক তার সামনে দেওয়ালে ৭০ মিঃ-মিঃ সিনেমা স্ক্রীনের মত একটা আয়না। সেই আয়নায় নিজের ক্লান্ত চেহারা দেখছি আমি। পাশে বসে গণেশদা অমলের বাঁ-হাতি অ্যাটাক সম্বন্ধে শেষ মুহূর্তের উপদেশ দিচ্ছেন, কিন্তু সেসব কিছু ঢুকছে না আমার কানে। হঠাৎ দেখি, আয়নায় আমার মুখটা আস্তে আস্তে মুছে গিয়ে অমলের মুখ ভেসে উঠল।

এই তো অমল। এই তো ওর মুখের সেই মার্কামারা হাসিটা। এই তো সেই অমল, যার সঙ্গে মহালয়ার শেষ রাতে উঠে বারোয়ারিতলায় প্রতিমা দেখতে যেতাম আমি। এই তো সেই অমল, যার সঙ্গে সাইকেলে চড়ে জীবনে প্রথম দলমা পাহাড়ের চুড়োয় উঠেছি। এই তো সেই অমল, যার সঙ্গে সরস্বতী পুজোর দুপুরে নদী পার হয়ে মালীর বাগানে পেয়ারা চুরি করতে গিয়ে হাঁটু ভেঙেছিলাম। এমনি আরো কত কত স্মৃতি! জামসেদপুরের নীল আকাশ আর সবুজ মাঠ জুড়ে শুধু ভেসে বেড়াচ্ছি আমি আর অমল, অমল আর আমি।

কেমন আছিস, অমল? ভাল? আমি একটুও ভাল নেই রে!

অমল শোন্, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। কিরে, শুনবি না? আমি জানি এখনও আমি ডাকলে তুই না এসে পারবি না।

কথাটা কী?

অমল, তুই আমাকে অনেকবার বাঁচিয়েছিস। আর একবার বাঁচিয়ে দে। আর এই শেষবার।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিস অমল, বার-বার আমার বাঁচার সমস্যাটা কেমন তোর হাতের মুঠোয় চলে আসে! তুই আমাকে আর একবার বাঁচিয়ে দে অমল।

তুই তো আমাদের বাড়ির অবস্থা জানিস রে! চাকরিটা আমার কেমন দরকার তা তুই নিজেই বল্! আমার মা, তোর সেই মাসিমা, যে তোকে প্রথম দিনই পায়েস খাইয়েছিল, সে না, জানিস, আজকাল ঠোঙা বানায়। ঠোঙা বানিয়ে দোকানে দোকানে দিয়ে আসে তবে আমার ভাইবোনগুলো দু-মুঠো খেতে পায়। বাবার কাবুলীওয়ালাগুলি তোর সেই মাসিমাকে আজকাল বিশ্রী ভাষায় গালাগাল দেয়, অপমান করে। আর জানিস, তোর যে মাসিমাকে তুই গোপনে বলতিস মা দুর্গার মত, সে না, আজকাল পাওনাদারদের ভয়ে মিথ্যা কথা বলছে রে, আর বলার পর লক্ষ্মীর আসনে লুকিয়ে কেঁদে ফেলছে ঝর-ঝর করে।

এই চাকরিটা আমার দরকার কি না বল্ তুই!

তুই আমাকে আর একবার বাঁচা অমল।

রাজ্য-চ্যাম্পিয়ান হওয়া তোর কাছে এমন কিছু একটা বড় ব্যাপার নয়। এমন কিছু লোভের নয়। তুই এর চেয়ে অনেক বড় টুর্নামেণ্ট জিতেছিস। আরও জিতবি। ইচ্ছা করলে এরপর পর-পর দশ বার রাজ্য খেতাব তুই তোর নিজের অধিকারে রাখতে পারিস। এবারটা ছেড়ে দে। আমি আর কোনদিনই লড়াইতে ফিরে আসব না, তোকে কথা দিচ্ছি।

অমল, এই অনুরোধটা তোকে আমি করব। আর আমি জানি, এখনও তুই মুখোমুখি আমার কোন অনুরোধ ঠেলতে পারবি না। বল্ পারবি!

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, গণেশদাকে বললাম—'গণেশদা আমি আসছি এখুনি।'

গণেশদা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন—'কোথায় যাচ্ছিস!'

'আসছি, এখুনি।'—বলে চট করে গ্রীনরুমের দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। তারপর লম্বা করিডোর দ্রুত পায়ে পেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম অমলের গ্রীনরুমের সামনে। দরজার বাইরে কতগুলি ছেলে জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

দরজা ঠেলে ঢুকতে যাচ্ছি, একটি ছেলে বাধা দিল—'কাকে চাই দাদা?'

—অমল বোসকে।'

—'আপনিই তো আজকের ফাইনালিস্ট!'

—হ্যাঁ। অমলকে আমার নাম করে বলুন আমি দেখা করতে এসেছি।'

ছেলেটি সসম্ভ্রমে ভেতরে ঢুকে গেল। এক মিনিট পরই ফিরে এসে বলল,—'সরি, অমল এখন কারো সঙ্গে দেখা করবেন না।'

—'দেখা করবে না! আমার নাম বলেছিলেন?'

—'বলেছিলাম। বললেন—'

—'কি বললেন?'

—'বললেন, রিং-এ দেখা হবে।'

—'ও।'

আমি আবার গট-গট করে করিডোর ভেঙে আমার গ্রীনরুমে ফিরে এলাম। গণেশদা উদ্বিগ্ন মুখে ভেতরে পায়চারি করছিলেন, আমাকে ঢুকতে দেখে বললেন,—'কোথায় গেছিলি?'

—'কোথাও না, এমনি একটু বাইরে খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে এলাম।'

॥ বারো ॥

তিনটে বাজতে দশ মিনিট আগে গণেশদা আমাকে ধরে রিং-এ নিয়ে গেলেন। আড়চোখে চেয়ে দেখি ওপাশে অমলও এসে পৌঁছেছে। রেফারির সামনে আমাদের দু-জনের উচ্চতা, ওজন এবং ডাক্তারি পরীক্ষা হল।

রেফারি প্রশ্ন করলেন,—'আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছেন?'

—সম্পূর্ণ সুস্থ।'

তিনটে বাজতে এক মিনিট আগে রিং-এ উঠলাম। গণেশদা শেষ মুহূর্তে আমায় কাঁধ চাপড়ে উৎসাহ দিলেন। কয়েক সেকেণ্ড পরই রিং-এ উঠল অমল। অমল রিং-এ ওঠামাত্র গ্যালারিতে হৈ-হৈ পড়ে গেল। বোঝা গেল এই ক-মাসেই অমল কেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গ্যালারি থেকে কয়েকটি উৎসাহী কিশোর আর তরুণ 'অমলদা, অমলদা' বলে চিৎকার করে উঠল। অমল পাকা পেশাদারি প্লেয়ারের মত হাসিমুখে হাত তুলে ওদের অভিবাদন গ্রহণ করল।

রেফারি এসে মাঝখানে দাঁড়ালেন। তিনটে বাজতে পনের সেকেণ্ড।

আমরা দু-জনে ধীরে ধীরে মাঝখানে এগিয়ে গেলাম। রেফারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দু-জনের ডান হাত ধরলেন। তারপর স্পষ্ট কিন্তু চাপা স্বরে বললেন,—'আপনাদের মধ্যে কোন শত্রুতা নেই তো?'

বক্সিং-এর আইন অনুযায়ী রেফারি এই কথাটা না বললেও পারতেন।

আমি চোখ তুলে তাকালাম অমলের দিকে। দেখলাম, অমল তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হল আমার।

কতদিন পর আবার অমলের সঙ্গে চোখাচোখি হল? ছ-মাস? সাত মাস?

অমল ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়ল—'না, নেই।'

রেফারি এবার আমার দিকে তাকালেন। অস্ফুট স্বরে আমি বললাম,—'না।'

রেফারি ঘড়ির দিকে তাকালেন। ঠিক তিনটে। বাঁশি বাজিয়েই আমাদের দু-জনকে রিং-এর দু-দিকে ঠেলে দিলেন।

শুরু হল ১৯৬৭-র পশ্চিমবঙ্গ চ্যাম্পিয়ানশিপের লড়াই।

অমল ওর রিং-এ পজিশন নিয়ে দাঁড়াল।

ওর কাঁধতুটো ধনুকের মত বেঁকে এল, তার আড়ালে চলে গেল ওর মুখ। এখন ওর সমস্ত মুখের মধ্যে দেখা যাচ্ছে শুধু ওর চোখতুটো যা ক্ষুধার্ত বাঘের মত জ্বলছে।

আমার রিং-এ আমি পায়ের নিচে জমি পাওয়ার চেষ্টা করলাম। অমল আস্তে, আস্তে ধীরে, সন্তর্পণে তু-দিকে সতর্ক চোখ রাখতে রাখতে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

এগিয়ে আসছে অমল আমাকে ওর প্রথম আঘাত হানার জন্য।

হঠাৎ আমার রক্তের মধ্যে রহস্যময়ভাবে কে যেন নড়ে-চড়ে উঠল। আমার রক্তের মধ্যে কে যেন চাপা গোঙানির মত ফিস-ফিস স্বরে বলে চলল,—'এখন আমাদের কী হবে, বাবা !'

আমার চোখের সামনে থেকে অমলের মুখ মুছে গেল। না, অমল নয়। রাক্ষস! ওকে ধ্বংস করে আমাকে পেতে হবে সোনার কাঠি-রুপোর কাঠির সন্ধান, যার ছোঁয়ায় রাজকন্যা জেগে উঠবে। আমার রাজকন্যা হল আমার চাকরি। ওই রাক্ষসটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমাকে খুন করার জন্য। কিন্তু ওকে আমার ধ্বংস করতে হবে! হবেই! জীবন, কী নিষ্ঠুর তুমি! এখানে বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই, পরিজন নেই। বেঁচে থাকার জন্য তোমাকে আর-একজনকে খুন করতে হবে। আমাকে বেঁচে থাকার জন্য সামনের ওই আড়ালকারী রাক্ষসকে মারতে হবে।

তাকে মারতে হবে—যে একদিন নিজের জীবন বিপন্ন করে ছ-ছটা খুনের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিল। আমার হাতের ছোবল তারই চোয়াল ভেঙে দিতে উদ্যত, যে একদিন আমার অসুস্থ শরীরের শিয়রে বসে পর-পর তিনবার 'ইণ্টার স্কুল চ্যাম্পিয়ানশিপে'র তুর্লভ গৌরব হেলায় নষ্ট করেছিল। অমল, তোকে আমার মারতে হবে। বেঁচে থাকতে হলে তোকে আমার মারতেই হবে।

অমল ওর অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসেই চোখের পলকে আমাকে আক্রমণ করল। ওর বাঁ হাতের প্রচণ্ড ঘুসি আমার মাথার উপর দিয়ে

উড়ে গেল। পরমুহূর্তে আমি ওর পাঁজরে আঘাত হানলাম। আঘাত হেনেই চোখ তুলতে দেখি, একি! অমলের মুখে যেন সেই মৃদু হাসিটা দেখলাম, যা জামসেদপুরেই দেখেছি শুধু! অমল এগিয়ে এসে আমার বাঁ কাঁধে 'জ্যাব' করল। আমি পিছিয়ে এসে ওর ঘাড়ে বাঁ হাতে আঘাত হানলাম। অমল পিছিয়ে গেল।

আমি মুহূর্তে একবার ভাবলাম অমলের ডিফেণ্ডিং জোন ভাঙতে এগোব কি না, কিন্তু আমার ভাবা শেষ হওয়ার আগেই অমল বিদ্যুতের মত আমার ডিফেণ্ডিং জোনে ছিটকে চলে এল। আমি ওকে আমার ডান হাতের মধ্যে পেলাম, আড়াআড়ি একটা হুক চালালাম ওর কানের নিচ দিয়ে। কিন্তু এত সহজে অমলকে পাব না জানতাম, ও প্রজাপতির মত আমার সামনে উড়ে গেল। আমার ডান হাত ফস্কাতেই আমার সম্পূর্ণ ডিফেন্স ভেঙে তছনছ হয়ে গেল, চকিতে মুখ তুলে দেখি অমল আমাকে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। আমি যেটুকু ভাবার সময় পেলাম তার মধ্যে ঠিক করে নিতে চাইলাম অমলের ওই অব্যর্থ ঘুসি মুখের ঠিক কোন্ জায়গায় নিলে আমি সেকেণ্ড রাউণ্ড অবধি লড়তে পারব।

ডিফেন্স-তছনছ-হওয়া অসহায় আমি, আর সামনে খুব এশিয়ান গেমসের গোল্ড হোলডার সম্পূর্ণ সুযোগ-সহ দুর্ধর্ষ বক্সার অমল বোস।

আঘাত পাওয়ার আগে আমি চোখ বন্ধ করলাম। আর ঠিক পরের মুহূর্তে গ্যালারি জুড়ে একটা চাপা নিশ্বাস বয়ে যেতে শুনলাম যেন।

আমি চোখ খুললাম।

চেয়ে দেখি অমল আমাকে আঘাত করতে এসে বাঁ পায়ের উপর মুচকে পড়ে গেছে, তাই সেই অবশ্যম্ভাবী আঘাতটা থেকে আমি বেঁচে গেলাম।

প্রথম রাউণ্ডও শেষ।

আর ঠিক তখনই সন্দেহের প্রথম খোঁচাটা আমাকে বিদ্ধ করল।

ওই অবস্থায় পা মুচকাল অমল!

গণেশদা ছুটে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন রিং-এর বাইরে। তোয়ালে দিয়ে আমার গা মুছিয়ে দিয়ে বাঁ কাঁধ ম্যাসাজ করে দিতে দিতে বললেন,—'তুই ওর বাঁ-দিক অ্যাভয়েড কর্। ডান দিক থেকে অ্যাটাক কর্। মনে রাখিস, ওর বাঁ হাতেই আছে ওর ম্যাচ জেতার চাবিকাঠি।'

আমার একবার ইচ্ছা হল গণেশদাকে জিজ্ঞাসা করি,—'গণেশদা, অমল ওই অবস্থায় পা মুচকাল কী করে?'

কিন্তু নিজেকে চেপে রাখলাম। চেপে রেখে দ্বিতীয় রাউণ্ডের জন্য প্রস্তুত হলাম।

শুরু হল দ্বিতীয় রাউণ্ড।

দ্বিতীয় রাউণ্ডের শুরুতেই অমল একটা গোঁয়ার, অশিক্ষিত বক্সারের মত এগিয়ে এসে আমার বাঁ কাঁধে 'জ্যাব' করল। আমি ডান দিকে চকিতে সরে এসেই দেখলাম অমল ওর সমস্ত থুতনি অরক্ষিত রেখেছে। আমার ডান হাতের প্রচণ্ড 'হুক' সঙ্গে-সঙ্গে অমলকে ছিটকে ফেলে দিল রিং-এর দড়ির উপর।

আমি ছুটে গেলাম। কিন্তু রেফারি আড়াল করে দাঁড়ালেন। অমলের মুখের কষ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। দু-সেকেণ্ডের মধ্যেই অমল নিজেকে সামলে নিল। নিয়েই এগিয়ে এল। এসেই অমল একটা ভেল্কি দেখাল। তার ছোট্ট এক পায়ের কাজে আমার সমস্ত মুখ অরক্ষিত হয়ে গেল। পলকের মধ্যে দেখলাম, অমল ওর বাঁ হাত তুলেছে। রিং-এর নিচ থেকে ওর কোচ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল,—'হিট হিম রাইট বিহাইণ্ড দি জ্য!'

কিন্তু একি, অমলের ঘুসির জোর এত কম! সেমিফাইনালে দেখেছি অমলের এক-একটা ঘুসি সনৎ মুখার্জির মত লড়িয়েকে দড়ির উপর ছিটকে ফেলে দিচ্ছে, সেই অমলের বাঁ হাতের ঘুসি, যা 'ম্যাচ-উইনার' নামে বিখ্যাত, সেই হাতের ঘুসি একটা সাধারণ ওজনের মত এসে পড়ল—না, তাও আমার সম্পূর্ণ অরক্ষিত মুখে নয়, কাঁধে!

আর মারার পরই দেখলাম, শিক্ষানবিশ বক্সাররা পর্যন্ত যে ভুলটা

করে না অমল সেটাই করেছে, আমাকে আঘাত করার পরও ও বাঁ হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে নেই, তাই ওর হাল্কা আঘাতটা কাঁধে নেওয়ার পরই আবার ওর অরক্ষিত মুখ পেলাম আমার ঠিক বুকের নিচে। চিন্তার সময় নেই। চকিতে আমার ডান হাতের প্রচণ্ড ঘুসি ওকে আবার টাল খাইয়ে ফেলে দিল দড়ির উপর।

আমি ছুটে যাচ্ছিলাম।

রেফারি ছুটে এসে দ্বিতীয় রাউণ্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

একটা বিশ্রী অস্বস্তি মনের কোণায় কোণায় চলাফেরা করতে চাইছে। কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। দ্বিতীয় রাউণ্ডের শেষে গণেশদা উৎসাহে উত্তেজনায় প্রায় ভরপুর। এখনও অবধি আমি যা খেলেছি তাতে আমার পয়েন্ট অমলের চেয়ে ঢের বেশী। গণেশদার খুশি হওয়ারই কথা।

আমার ভেতর সেই উৎসাহের অভাব দেখে গণেশদা অবাক হলেন। কিন্তু আমার অস্বস্তির কথাটা আমি গণেশদাকে জানাই কী করে!

গণেশদা তোয়ালে দিয়ে আমার কাঁধ মুছিয়ে দিচ্ছিলেন। আর অনর্গল উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন,—'ও ডান পা বাড়ালেই তুই পাশে সরে যাবি। সব সময় ওকে আড়াআড়ি রাখার চেষ্টা করবি! আর ওর ডিফেন্সিং জোন এখনই তোর ভাঙতে যাওয়ার কোন দরকার নেই। ওকেই আসতে দে।'

রেফারি রিং-এর মাঝ-বরাবর এসে তৃতীয় রাউণ্ডের সূচনা ইঙ্গিত করলেন।

শুরুতেই অমল এগিয়ে এল মাঝ রিং অবধি। আমি এগোলাম না। সমস্ত গ্যালারিতে পিন ফেললেও বুঝি শব্দ হয়। অমলের তীক্ষ্ণ শিকারী চোখ আমার মুভমেণ্ট লক্ষ্য করছে। হননোদ্যত কালকাউটের মত ওর সম্পূর্ণ শরীর তখন অল্প-অল্প দুলছে। ওই চোখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতর কেমন হিম ছড়িয়ে গেল। মনে হল, আর রক্ষা নেই।

আর সত্যিই নেই।

কী হল কে জানে! যে কেউটে ডাইনীর বংশ, একমাত্র তার শরীরেই বুঝি ওই পিচ্ছিলতা সম্ভব। অমল ঠিক সেইভাবে পিছলে মাঝ রিং থেকে চলে এল আমার বাঁ পাশে। আমি ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, আমার উদ্যত ডান হাত ও অবহেলায় বাঁ কাঁধ পেতে আটকে দিল এবং আমি আর-একবার বিপন্ন, বিপর্যস্ত হয়ে আশঙ্কিত বক্সারের মত চরম ভুল করে ফেললাম। আমার শেষ ডিফেন্স বাঁ হাত তুলে ওকে আঘাত করতে গেলাম। সমস্ত গ্যালারি উঠে দাঁড়িয়েছে, এবার বাংলার প্রিয় বক্সার অমল বোস তার প্রতিযোগীকে শেষ করছে নির্ঘাৎ!

না, আমার অরক্ষিত থুতনি, মুক্ত চোয়াল, আর ডিফেন্সহীন কানের উপরের রগ—কোনটাতেই নয়, অমলের একটা ঈষৎ মাঝারি ওজনের ঘুসি এসে পড়ল আমার শক্ত কপালে। অথচ অমল এমন ভান করল যেন ওর সমস্ত বাঁ হাতের শক্তি দিয়ে ও আঘাত করেছে।

আর ওই আঘাত খেয়েও আমি দড়ির উপর ছিটকে না গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে তাবৎ গ্যালারি যেন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল।

আমি দ্রুত বাঁ পা বাড়িয়ে ওকে আমার ডান দিকে ফেলে দিলাম। ফেলে দিয়েই ভাবলাম, ওর কাঁধে 'জ্যাব' করব। কিন্তু একি, চোখ তুলতেই দেখি অমল ওর থুতনি আবার আমার ডান হাতের সামনে অরক্ষিত রেখেছে। আমি ডান হাত তুলতেই অমল চাপা কণ্ঠে বলল —'মার্, থুতনিতে মার্!'

অমলের চোখে সেই হাসিটা খেলে বেড়াচ্ছে আবার। আমার শরীরের ভেতর কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল। আমার ডান হাতের প্রচণ্ড 'ফুল-লেংথ হুক' তখন ওর থুতনিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। অমল টলতে টলতে গিয়ে পড়ল দড়ির উপর। রেফারি আসার আগেই আমি চকিতে ছুটে গেলাম। আমার বুকের নিচেই পেলাম ওর সম্পূর্ণ অরক্ষিত মুখ। ওর মুখ দিয়ে তখন ঝলকে ঝলকে রক্ত গড়াচ্ছে। কিন্তু ওর চোখের ভেতর সেই দুষ্টু হাসিটা কেমন বিজয়ীর মত উঁকি

দিচ্ছে। অমলের এ সেই হাসি, যা আমাকে নিয়ে দশ নম্বর বস্তি থেকে পালিয়ে আসার সময় ওর মুখে দেখেছিলাম। আমার মাথা তখন খারাপ হয়ে গেছে। আমার ডান আর বাঁ হাতের পর-পর আটটা ঘুসি ওর সমস্ত মুখ তখন গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। অমল আস্তে আস্তে রিং-এর মধ্যে গড়িয়ে গেল। রেফারি ছুটে এসে গুনতে শুরু করলেন —এক দুই তিন···

পাঁচ অবধি গোনার পর অমল একবার ওঠার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তারপরই আবার গড়িয়ে গেল রিং-এ উপুড় হয়ে। ওর হাতদুটো লম্বা হয়ে রিং-এর মাটি আঁকড়ে ধরতে চাইল। আমার মনে হল, রিং-এর মাটি নয়, অমল আমাকে ছুঁতে চেয়েছিল।

সমস্ত গ্যালারিতে তখন পিন পড়লে শব্দ হয়।

রেফারি দশ গোনা শেষ করে আমার হাত আকাশে তুলে ধরে ঘোষণা করলেন খেলার ফলাফল।

অমলের শক্ত, আড়ষ্ট শরীরে তখন চৈতন্য লেশমাত্র নেই। অ্যাম্বুলেন্সের ব্যস্ত কর্মীরা ওর দেহ দ্রুত তুলে নিচ্ছে স্ট্রেচারে।

গণেশদা ছুটে এসে রিং থেকে নামালেন আমায়। আমার ক্লান্ত অবসন্ন শরীর তখন টলছে। আমি শরীরে মার খাই নি, মনে খেয়েছি। এই মার কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু গণেশদা বোধহয় এতক্ষণে সব বুঝতে পেরেছেন। আমার অবসন্ন শরীর জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে রিং থেকে নামালেন।

রিং থেকে নামতেই পাশ থেকে উঠে এলেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ দত্ত। এসে আমার পিঠ চাপড়ে কনগ্রাচুলেট করলেন —'ওয়েল ডান, ইয়াং ম্যান! একেবারে নক আউটে জিতবে আমি আশা করি নি। কালই এসো আমার অফিসে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আমি রেডি করে রাখব।'

আমি মৃদু হেসে তাঁকে অভিবাদন করলাম।

গণেশদা আমাকে ধরে ধরে নিয়ে গেলেন গ্রীনরুমে। ঢুকেই আমি গণেশদাকে ধরে কেঁদে ফেললাম,—'এ কী হয়ে গেল গণেশদা!'

রুদ্ধবাক গণেশদা শুধু আমার পিঠে তাঁর হাতদুটো বুলিয়ে দিলেন।

—'অমল আমাকে এভাবে হারিয়ে দিল! আমাকে এভাবে ছোট করে দিল ও! কেন গণেশদা, আমি ওর কী শত্রুতা করেছি!'

কান্নার আবেগে আমার শরীর থরথর করে কাঁপছে। কিছুতেই সামলাতে পারছি না নিজেকে। চোখ তুলে চমকে উঠলাম। দেখি, গণেশদার চোখ দিয়েও অবিরল গড়িয়ে যাচ্ছে জল। গণেশদা রুমাল দিয়ে চোখ চাপা দিলেন, চাপা ভাঙা কণ্ঠে ফিসফিস করে বললেন,—'অমল কত বড় ছেলে তা ও কোনদিনই আমাদের বুঝতে দেয়নি। চিরকাল ওর ফুট-ফলাসে আমাদের বোকা বনিয়ে গেল, না রে!'

আমি সামনের টেবিলে মাথা রাখলাম। তুই আমাকে এভাবে চাকরিটা পাইয়ে দিলি অমল! চাকরি পাইয়ে দিলি না, আসলে তুই আমাকে আর একবার বাঁচিয়ে দিলি। এইভাবে তুই আমাকে আর কত দিন বাঁচাবি অমল!

এখন এক-এক করে সমস্ত রহস্যের জট খুলে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি কেন অমল এবার টুর্নামেন্টে নাম দিয়েছিল। ও জানত, সনৎ, টমাস বা নাইডুর সঙ্গে লড়লে আমি নাও জিততে পারি। কেননা আমার প্র্যাকটিস নেই। ওরা ভাল লড়ছে। অমল তাই টুর্নামেন্টে নাম দিল। আর শুধু দিলই না, ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করে সব বড়-বড় প্রতিযোগীদের টেনে নিল নিজের দিকে আর আমাকে ঠেলে দিল অন্য গ্রুপে যাতে আমি ফাইনালে উঠি। আর আমি ফাইনালে উঠলে আমার চাকরি পাওয়া ওর হাতের মুঠোয়। তাই বক্সার জীবনের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক মাথা পেতে নিতেও অমলের বাধল না, তিন রাউণ্ডে নক আউট হয়ে গেল ও।

কী অভিমান তোর অমল! এখন বুঝতে পারছি তোর কাছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার বন্ধুত্ব, মনুষ্যত্ব! তাই আমার বাবার টেলিগ্রাম পাওয়ার পর তুই আমার পাশে এসে দাঁড়াতে চেয়েছিলি। তোর কাছে এশিয়ান গেমস তুচ্ছ। কিন্তু আমি তোকে বলেছিলাম,—

'আমার ব্যাপারে মাথা ঘামাস না। এশিয়ান গেমস তোর কাছে অনেক বড় ব্যাপার!'

দুর্জয় অভিমানে তাই তুই এশিয়ান গেমসে গিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলি, এশিয়ান গেমস সত্যিই তোর কাছে বড় ব্যাপার। কিন্তু আমাদের ব্যথা দিতে গিয়ে তুই নিজেই পেলি বেশী ব্যথা। গত ছ-মাসে সমস্ত অভিমান সমস্ত ব্যথা তুই একা একা বয়ে বেড়িয়েছিস, অমল। আমার তো তবু গণেশদা ছিলেন। তোর কে ছিল!

টেবিলের উপর মাথা রেখে কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না। হঠাৎ দরজায় খুট করে শব্দ হতে মাথা তুললাম। থমথমে মুখে ঘরে ঢুকলেন বিমানদা,—'এইমাত্র খবর এল অমলের অবস্থা খুব খারাপ। মাথায় অস্ত্রোপচার হবে। ডাক্তার কিছু বলতে পারছেন না, ফিফটি-ফিফটি চান্স!'

আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ালাম,—'কোথায় অমল?'

—'পি. জি.-তে।'

—'আপনার গাড়িটা আছে?'

—'আছে।'

—'চলুন আমাদের পৌঁছে দেবেন।'

ঝড়ের মত গাড়ি চালিয়ে আমি, গণেশদা আর বিমানদা পি. জি. হাসপাতালে পৌঁছলাম। দৌড়ে চলে এলাম অমলের বেডের পাশে। ওর চারপাশে ডাক্তার-নার্সের ভিড়। এখুনি ওকে নিয়ে যাওয়া হবে অপারেশন টেবিলে। তারই প্রস্তুতি চলছে। একজন নার্সকে ঠেলে আমি অমলের পাশে পৌঁছলাম। ফিস-ফিস করে ডাকলাম,—'অমল!'

অমলের তখন জ্ঞান ফিরে আসছে। আস্তে করে চোখ খুলল। খুলেই আমাকে দেখল। ওর একটা হাত আস্তে আস্তে উঠে এল ওর বুকের উপর। আমি দ্রুত আমার হাতের মুঠোয় ওর হাত ধরলাম,—'অমল! অমল—তুই!'—অসহ্য আবেগে আর কষ্টে আমার গলা রুদ্ধ হয়ে এল।

অমল হাসল,—'আমি না তোর বন্ধু! বন্ধু অমল!'

বন্ধু অমল! বন্ধু পবিত্র!! অমলের মুখে সেই হাসিটা আরো চওড়া হল, যে হাসি অমল অজস্র বিলিয়েছে জামসেদপুরের নীল আকাশ আর সবুজ মাঠে।

একজন ডাক্তার আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন,—'এবার ওঁকে নিয়ে যাব।'

অমলের ট্রলি চলতে শুরু করেছে। আমি ওর পাশাপাশি এগোচ্ছি। ওর হাত আমার হাতে। লম্বা করিডোরের শেষে একটা বাঁক ফিরতেই সামনে অপারেশন থিয়েটার। থিয়েটারে ঢোকার আগের মুহূর্তে আমি ফিস-ফিস করে ওর কানে-কানে বললাম,—'জিতে ফিরে আসা চাই! আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।'

উত্তরে অমল হাসল।

ওর ট্রলি থিয়েটারের ভেতর ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল আস্তে আস্তে। দরজার মাথায় লাল আলোটা চট করে জ্বলে উঠল: সাইলেন্স প্লীজ।

অপারেশন থিয়েটারের সামনের লম্বা সোফায় আমাদের তিনজনের নিস্পন্দ তিনটে শরীর। আমি, গণেশদা আর বিমানদা। আমার ক্লান্তি নেই। থিয়েটারের মাথার লাল আলোর বিজ্ঞপ্তি কখন যেন আমার চোখে একটা ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। আর সেই ফুল যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না। ওই ফুলের কি নাম আমি জানি না। ফুলটা নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। ওর ভেতরে অমল আছে। অমল, এখন তুই কোন্ রাউণ্ডে লড়ছিস!

কতক্ষণ বসে আছি জানি না।

আড়চোখে বিমানদার ঘড়িতে চেয়ে দেখি, রাত প্রায় সাড়ে চারটে। অপারেশন টেবিলের দরজা খুলে গেল নিঃশব্দে। নিঃশব্দ কিন্তু প্রত্যয়পূর্ণ পদক্ষেপে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন ভারত-বিখ্যাত ব্রেন স্পেশালিস্ট ডঃ মৈত্র।

আমাকে দেখে মৃদু হেসে এগিয়ে এলেন উনি, আমার কাঁধে হাত

রাখলেন,—'অপারেশন সাকসেসফুল। আপনারা নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন। আর কোন ভয় নেই।'

হঠাৎ কী হল কে জানে! জ্যা-মুক্ত তীরের মত আমার ভেতরে অনেকক্ষণের একটা রুদ্ধ আবেগ ছুটে বেরিয়ে আসতে চাইল। আমি ছুটে সামনের বারান্দায় নেমে এলাম। মাথার উপর শরতের অবারিত আকাশ। নীল, গভীর। শুকতারার ঠিক নিচ দিয়ে আলোর একটা অস্পষ্ট চাঁদোয়া খুলে যাচ্ছে। আকাশের অঙ্গনে আজ কোন উৎসবের আয়োজন বুঝি। ভোর হচ্ছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে হু-হু করে। আকাশের মস্ত পট জুড়ে আলোর উজ্জ্বল রুপালি চাঁদোয়া দুলছে ধীরে ধীরে।

আমার মনে হল দূরে কোথাও একরাশ শিউলি ফুল ফুটে উঠল। আমার কানে বাজছে দুর্গাপুজোর ঢাকের শব্দ।